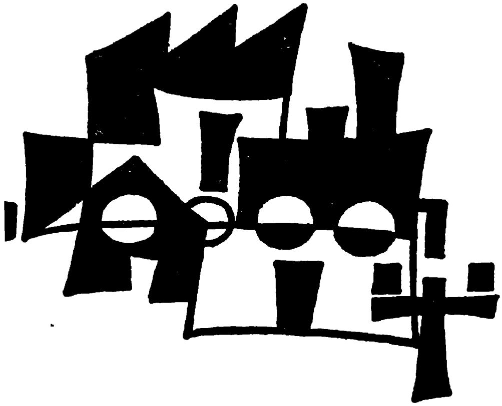
বন্দর নগরী



অমল দাশগুপ্ত

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলি-৬

প্রকাশক
সুনীলকুমার ঘোষ এম. এ.
পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১ বি, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম মুদ্রণ—৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

মুদ্রাকর
সতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

শীর্ষচিত্র
অজয় চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী

মা ও বাবার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের নিবেদন

পপুলার লাইব্রেরির পক্ষ থেকে যেদিন প্রস্তাব এল তাঁরা 'কারা-নগরী' নতুন করে ছেপে প্রকাশ করতে চান, আমি গোড়ায় রাজী হয়নি। যে সময়ের কথা কারা-নগরীতে এসেছে তা ভারতের স্বাধীনতা-লাভের অব্যবহিত পরবর্তী কাল, পাঁচসালা পরিকল্পনা তখনো শুরু হয়নি, পাবলিক সেকটর গড়ে ওঠেনি, সরকারী ব্যবস্থাপনায় একটি-দুটি বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের সবে গোড়াপত্তন হচ্ছে। এমনি একটি শিল্পোদ্যোগকে ঘিরে নতুন যে শিল্প-নগরী তারই, সামগ্রিক নয়, টুকরো একটি অংশের কাহিনী 'কারা-নগরী'। ব্রিটিশ রাজত্বে প্রশাসন যারা চালাত, পুলিশী সন্ত্রাস যারা কায়েম করত, স্বাধীনতার আন্দোলনকে যারা দমন করত—তারা স্বাধীনতা-উত্তর কালেও ক্ষমতার আসনে থেকে গিয়েছিল। ফলে শ্রমিকদের ইউনিয়ন পর্যন্ত স্বীকৃতি পেত না, পাঁচজনে যে-কোনো উপলক্ষে জড়ো হলেই সেটা রাষ্ট্র-বিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হত। নির্যাতন হয়ে উঠত আরো নির্মম। শিল্প-নগরী হয়ে উঠত কারা-নগরী। অল্প কয়েকজন মানুষের মধ্যে দিয়ে হলেও এই কারা-নগরীর একটি চিত্রই এই উপন্যাসের বিষয়।

এখনকার পাঠক এই চিত্রের সঙ্গে পরিচিত নন। যদিও এখন শিল্পোদ্যোগ নির্মিত হয়েছে আরও অনেক বিশাল আকারে, পাবলিক সেকটর এখন প্রবল পরাক্রান্ত। শিল্প-নগরীর আকার ও আয়তন অনেক বিরাট। সেখানে যাবার রেললাইনের ওপর থেকে কানাডিয়ান একস্-বি ইঞ্জিন অনেক আগেই অপসৃত। সেখানে কোনো কর্মচারীর বেতন এখন পঁয়ত্রিশ টাকায় থাকাটা অকল্পনীয়। সবই বদলে গিয়েছে, এমনকি সুতোর লাছির দামও। সবচেয়ে বড়ো কথা, ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে জবরদস্ত রকমের, একটি, একটির বেশিও। আর ইউনিয়নের প্রবল প্রতাপ, জেনারেল ম্যানেজারকে পর্যন্ত ইউনিয়নের সায়

ও সম্মতি নিয়ে চলতে হয়। মে-দিবস এখন স-বেতন ছুটি। মে-দিবসে খোদ কারখানার কেতন-দণ্ডে লালঝাণ্ডা উড়ে থাকে।

'কারা-নগরী'তে যে-অবস্থা, যে-পরিস্থিতি, যে পরিণতি ও যে-পরিণামের কথা বলা হয়েছে তার কোনো অস্তিত্ব এখন আর নেই, থাকতে পারে না। এখন-কার পাঠকের কাছে 'কারা-নগরী' অলীক ও অবাস্তব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই গোড়ায় ভেবেছিলাম, 'কারা-নগরী' পুনঃ-প্রকাশের কোনো সার্থকতা নেই। পপুলার লাইব্রেরীর প্রস্তাবে সম্মত হইনি। তারপরে কারা-নগরীর অবস্থান যে-এলাকায় সেখানকার একজন ট্রেডইউনিয়ন নেতা হঠাৎ মারা গেলেন। এঁকে আমি চিনতাম। কারা-নগরীরই মানুষ তিনি, কারা-নগরীর প্রোজেক্টে একসময়ে কাজও করেছিলেন। পরে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন করার অপরাধে ছাঁটাই হয়ে যান এবং তারপর থেকেই সর্বক্ষণের ট্রেডইউনিয়ন-কর্মী। শুধু কারা-নগরীর এলাকায় নন, আশেপাশের বিরাট এলাকায় তিনি এক প্রতিষ্ঠিত নাম।

তাঁর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই কারা-নগরীতেই। কলকাতা থেকে অনেক ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা গিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে অনেক কবি-সাহিত্যিক-গায়কও। এই সভার বিবরণ একটি দৈনিকে বেশ বড়ো করে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিবরণে দেখলাম, প্রয়াত নেতার স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান দেখানো হয় 'কারা-নগরী' থেকে পাঠ করে। সভার উদ্যোক্তারা, সভায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের দু-একজনের মাধ্যমে, 'কারা-নগরী'র লেখকের কাছে অনুরোধও পাঠিয়েছেন তিনি যেন নিজে গিয়ে একবার দেখে আসেন সেই কারা-নগরী এখন কী হয়েছে, সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবন এখন কত অবাধ, ট্রেডইউনিয়ন অধিকার কত সুরক্ষিত। ব্যারিয়ার গেট তুলে এখন আর কাউকে সেখানে আটকানো যায় না, দুরন্ত বিপ্লবীকেও নয়। সিংহদরজা দিয়েই সকলের যাতায়াত।

এই কাহিনী তো আর অজানা নয়। এখনকার সাহিত্যেও এই কাহিনী

এসে গিয়েছে। মানুষ এখন অনেক বেশি স্বাধীন, অনেক বেশি সচেতন। কে দাবিয়ে রাখে তাকে!

তবুও বলতে হয়, এই কাহিনী হঠাৎ হয়ে ওঠেনি। অনেক সহ্য করতে হয়েছে, অনেক লড়াই। এই ঐতিহ্যে গর্ববোধ করতে হলে ধারণা থাকা দরকার কী ছিল।

কী যে ছিল, তারই চিত্র 'কারা-নগরী'। ট্রেড-ইউনিয়ন নেতার স্মরণ-সভায় যদি এই লেখা এখনো পঠিত হতে পারে, পঠনের উদ্দেশ্যও যদি সার্থক হয়, তাহলে সাধারণ পাঠকও এই লেখায় এখনো আগ্রহী থাকতে পারেন।

এই ভেবেই, প্রথম প্রকাশের প্রায় ছাব্বিশ বছর পরে, 'কারা-নগরী' পুনঃ-প্রকাশে সম্মত হয়েছি। ঠিক করেছি কিনা, সে রায় পাঠকরা দেবেন।

সবুজ পাহাড়ের সেই লোকটি



ষোলো মাসের রুদ্ধশ্বাস জীবনের স্মৃতিকথা লিখতে বসেছি।

এক নির্মীয়মাণ শিল্পনগরীতে চাকরি পেয়েছিলাম এবং এই সুযোগে বাংলা ও বিহারের সীমানায় এক বহুঘোষিত শিল্প-উদ্যোগকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল। মাত্র ষোলো মাসের অভিজ্ঞতা, কিন্তু মনে হয় জীবনের এক বৃহৎ পাঠ সমাপ্ত করে এসেছি।

পশ্চিমবাংলার পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশের এই শিল্প-উদ্যোগের ওপর ভারত সরকারের ডকুমেণ্টারি ফিল্ম্ আছে। সম্ভাব্য সমস্ত প্রচারযন্ত্র মারফত অনবরত প্রচার করা হচ্ছে, এই শিল্প-নগরী নাকি চাকুরিজীবীদের স্বর্গরাজ্য। চাকুরিজীবীদের এই 'স্বর্গরাজ্যে' ষোলো মাস বাস করার অভিজ্ঞতা নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসার পর আমি কিন্তু এক দুঃসহ কারা-জীবন থেকে মুক্তির আস্বাদ অনুভব করছি। খাওয়াপরা-থাকার নিশ্চয়তাটুকুই যে জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা নয় এই অভিজ্ঞতা এমন মর্মান্তিকভাবে আর কারও জীবনে যেন না আসে।

স্মৃতির পর্দায় অজস্র চিত্র ভিড় করে আসছে। বিশেষ করে কতকগুলো অত্যন্ত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ঘটনা কিছুতেই যেন ভুলতে পারছি না। আশ্চর্য উজ্জ্বল রঙেরেখায় প্রাণবন্ত কয়েকটি ঘটনা। এতদিন পরে মনে হচ্ছে, সেই ষোলো মাসের জীবনে সবটাই অন্ধকার নয়। মনের মণিকোঠায় জমা করে রাখার মতো কিছু সঞ্চয়ও আছে।

মনে পড়ছে বিরূপাক্ষকে। খালাসী বিরূপাক্ষ, তিন বছরে আট আনা হিসেবে

ইন্‌ক্রিমেণ্ট পেয়ে মাইনে দাঁড়িয়েছে একত্রিশ টাকা আট আনা। এই সামান্ত মাইনে থেকে অল্প অল্প জমিয়ে ও যে প্রায় দেড়শো টাকা সঞ্চয় করেছে তা আমি জানতাম না। পরে জেনেছি, পাঁচশো টাকা জমাতে পারলেই ও দেশে চলে যাবে, মহাজনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবে জমিজমা, তারপর থাকবে চাষবাস নিয়েই। ওর এই সঞ্চয়ের কথা কি করে টের পেলাম তাই বলি।

এই ষোলো মাসের চাকরি-জীবনে ঘটনাচক্রে আমাকে একটা মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। এই মামলার কথা যথাসময়ে বিস্তৃতভাবে বলব। যেদিন মামলার তারিখ পড়ে তার আগের দিন মোক্তারের কাছে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম যে জামিন ইত্যাদির জন্তে অন্তত পঞ্চাশটা টাকা চাই। সারা দিন অনেক চেষ্টা করেও টাকাটা যোগাড় করতে পারলাম না। সন্ধ্যার সময় একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে কোয়ার্টারে বসে আছি, এমন সময় দরজায় ঠুকঠুক্ শব্দ।

সা'ব!

ডাক শুনেই বুঝতে পারি যে আমার কোনো খালাসী ডাকছে। আমার চাকরিটা সিনিয়র সাবর্ডিনেট পর্যায়ের। সরকারী কর্মচারীদের শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে তৃতীয় শ্রেণীর হলেও আমি হচ্ছি একটি শাখার সর্বোচ্চ পদাধিকারী। এই বিচারে চতুর্থ শ্রেণীর খালাসীদের সম্বোধন—সা'ব! এমনকি তৃতীয় শ্রেণীর কেরানিরাও 'স্যার' বলে ডাকে। এই হচ্ছে এখানকার রীতি। এর অন্তথা হলে চাকরি-জীবনে নানাভাবে হেনস্থা হতে হয়।

দরজা খুলে দেখি, বিরূপাক্ষ। মিশমিশে কালো রঙ আর একরাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। সামনের দুটো দাঁত নেই। কথা বলে জড়িয়ে জড়িয়ে। পা দুটো ধনুকের মতো বাঁকা, এমনভাবে হাঁটে যে মনে হয় এক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। অথচ আমি ওকে মাথায় দু-মন বোঝা নিয়ে চলতে দেখেছি। তখনো সেই একই ধরনের হাঁটা কিন্তু বোঝার ভারে এতটুকু নুয়ে পড়ে না পর্যন্ত।

বিরূপাক্ষ ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, বললে, তুর টাকার দরকার ?

খালি পায়ে একরাশ ধুলো, তেল চিটচিটে কাপড় হাঁটুর ওপর তোলা, উস্‌কো খুস্‌কো

চুলে বহুকাল তেল পড়েনি। একটা খাকি হাফশার্ট গায়ে দিয়েছে, ময়লা কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু পর্যায়ক্রমে ঘামে ভিজে আর শুকিয়ে সাদা সাদা দাগ পড়েছে—অনেকটা এই বিহার সংলগ্ন দেশের চিড়-খাওয়া রুক্ষ জমির মতো।

তুর টাকা চাই?

কী বলব ঠিক করতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

এই নে।

পাঁচখানা দশটাকার নোট। কয়লাখনির গহ্বর থেকে হীরে বেরিয়ে আসার মতো সেই তেল চিট্‌চিটে কাপড়ের ভাঁজ থেকে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমি বোধ হয় কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলাম। ভালো করে তাকিয়ে দেখি বিরূপাক্ষ নেই।

পরের মাসে মাইনে পেয়েই বিরূপাক্ষের টাকা শোধ দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে মনে হয়, বিরূপাক্ষের ঋণ শোধ করতে পারিনি। সারা জীবনে এই ঋণ শোধ হবে কিনা সন্দেহ।

মনে পড়ছে শম্পাকে। বেণীসংবদ্ধকুন্তলা সেই কালো মেয়েটি। বি এস-সি পড়তে পড়তে হঠাৎ ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে চাকরি নিতে হয়েছিল। সেই রুদ্ধশ্বাস জীবনে এই মেয়েটিই ছিল খুশির দমকা হাওয়ার মতো। কখনও মুখ ভার করে থাকতে দেখিনি। নিজে যেমন কলকল করে কথা বলত তেমনি সেই কলধ্বনির সঙ্গে সুর মেলাতে হত সবাইকে।

নগরীর কেন্দ্রে সবুজ আলোজ্বলা একটা পাহাড়। আমরা বলতাম, সবুজ পাহাড়। মনে পড়ে, একবার এই সবুজ পাহাড়ে অনেক রাতে আমরা দুজনে গিয়ে একটা পাথরের ওপরে বসেছিলাম। প্রায় সুষুপ্ত নগরী, শুধু রাস্তার আলোগুলো মালার মতো দুলছিল। হঠাৎ কি খেয়ালবশে শম্পা গান গেয়ে উঠেছিল : জনম মরণ জীবনের দুটি দ্বার। ও যে এত ভালো গান গাইতে পারে তা আগে জানা ছিল না। সেজন্যেই হোক বা সেদিনকার সেই আশ্চর্য পরিবেশের জন্যেই হোক্, আমার সমস্ত অন্তর সেই গানের সঙ্গে সায় দিয়ে উঠেছিল।

জীবনে সেই একবার মাত্র মনে হয়েছিল, মৃত্যুও কাম্য, খুব বড়ো রকমের আনন্দের মধ্যে দিয়ে যে-জীবনের অবসান, সে-জীবন তো সার্থক।

পরে অনেক বড়ো শিল্পীর কণ্ঠে এই গানটি আমি শুনেছি, কিন্তু সেই আশ্চর্য অনুভূতি আর কোনোদিন হয়নি।

কয়েক দিন পরে এই সবুজ পাহাড়ের ওপরেই সম্পূর্ণ অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেদিন একা গিয়েছিলাম। তেমনি সুষুপ্তপ্রায় নগরী, তেমনি মালার মতো রাস্তার আলো। পাহাড়ের ওপরে উঠে দেখি সেই বড়ো পাথরটার একধারে একটি লোক মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে আছে। একটু ইতস্তত করে আমিও সেই পাথরটারই অন্য একধারে বসলাম। ষোলো মাসের চাকরি-জীবনে বহুবার সেই সবুজ পাহাড়ে উঠেছি, কখনো একা কখনো দু-তিনজনে, কিন্তু একবারও অন্য কোথাও বসিনি। মাঝে মাঝে মনে হত, পাথরের মধ্যেও যেন একটা নিঃশব্দ প্রাণপ্রবাহ আছে। কান পেতে থাকলে এক অনুচ্চারিত বাণী শোনা যায়, চোখ পেতে থাকলে এক রেখাসমন্বিত লীলায়িত ভঙ্গিতে নেচে ওঠে, স্পর্শ করলে একক সান্নিধ্যের উত্তাপে নিবিড় হয়ে ওঠে। কথাগুলো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু যাঁদের দীর্ঘ কারাজীবনের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা এই কথার সমর্থনে বহু সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারবেন। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও একক মানুষ পৃথিবীতে একজনও নেই। নির্জন কারাবাসেও মানুষ বস্তুজগতের ওপরে জীবন আরোপ করে তাকেই সঙ্গী করে তোলে। মানুষের এই আশ্চর্য ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ এই পৃথিবীকে এত গভীরভাবে ভালোবাসে।

যাক্‌, যে-কথা বলছিলাম। পাহাড়ের ঠিক শীর্ষদেশে সবুজ তারার মতো একটা সবুজ আলো। আলোর নিচে কংক্রিটের গাঁথুনি দেওয়া একটা শেড। আর শেডের ছায়ায় একপাশে এই পাথরটা। পাথরের ওপরে বসলে সবুজ আলোর আভাটুকু মাত্র চোখে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে ঘাসের চিহ্নমাত্র নেই, গৈরিক-বর্ণের মাটি আর বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই, কিন্তু সবুজ আলোজ্বলা রাত্রির পটভূমিকায় মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে হয় খুব নরম আর কচি ঘাসে পাহাড় যেন

ছেয়ে গেছে। তাকিয়ে থাকলে গা শিরশির করে ওঠে।

সেদিন রাতেও তাই মনে হয়েছিল। আমার মনে আছে, কলেজে পড়বার সময় একটি বাচ্চা মেয়েকে কিছুদিন পড়িয়েছিলাম। অনেক বছর বাদে একদিন সাদার্ন এভিনিউর ঘাসের রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ বাস থেকে নেমে একটি মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, ভালো আছেন মাস্টারমশাই? তাকিয়ে দেখলাম। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও সেই উদ্ভিন্ন-যৌবনার মধ্যে বহু বছর আগেকার হাড়-বের-করা টিঙটিঙে মেয়েটিকে খুঁজে পাইনি। দিনের আর রাতের সবুজ পাহাড়ের মধ্যেও এই আশ্চর্য রূপান্তর। দিনের বেলা যা রুক্ষ, দীর্ণ, অজস্র ফাটলে কুৎসিত রাত্রিবেলা তাই নবোদ্ভিন্ন-যৌবনার মতো রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে।

এসব কথাই ভাবছিলাম। আমার পাশেই যে আরেকজন বসে আছে, ভুলেই গিয়েছিলাম সে-কথা। হাতে সিগারেট ধরানো ছিল, সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে আগুন যে কখন আঙুলের কাছাকাছি চলে এসেছে তাও টের পাইনি। হঠাৎ আঙুল দুটো জ্বালা করে উঠতেই 'উঃ' বলে সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। পাশের লোকটি ভয়ানকভাবে চমকে উঠল। আমি টের পেলাম, কারণ আমার মনে হল পাথরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। চমকে উঠে লোকটি একবার মাত্র মুখ তুলেছিল। সেই ছায়া-ছায়া আলোতেও মনে হল, কেমন এক আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টি, মুখের চেহারাটাও যেন বিকৃত ও বীভৎস হয়ে উঠেছে। তারপরেই লোকটি আবার আগের মতোই মুখ গুঁজে বসে রইল।

আমি এবার ভালো করে লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এমনভাবে সারা গায়ে মুড়ি দিয়েছে যে হঠাৎ দেখে ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, লোকটির সারা শরীর একটু একটু করে কাঁপছে আর একটা চাপা গোঙানির মতো আওয়াজও যেন শুনতে পাচ্ছি। হয়তো আমারই ভুল। বাতাসে কাপড় নড়ছে আর বাতাসের ধাক্কায় পাথরের ফাটল থেকে গোঙানি উঠছে, এমনও হতে পারে। তবুও প্রচণ্ড একটা কৌতূহল হল।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে লোকটির দিকে বাড়িয়ে ধরে ডাকলাম, শুনছেন ?

লোকটি মুখ তুলে তাকাল, তারপর বললে, আমাকে কিছু বলছেন ?

যদি কিছু মনে না করেন, একটা সিগারেট নিন।

এবার আর আমার ভুল নয়, স্পষ্ট শুনতে পেলাম ও দেখলাম, কান্নার মতো একটা আওয়াজ তুলে লোকটি প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকুনি দিলে।

না! না! না!

আমারও কেমন একটা রোখ চেপে গেছে। বললাম, আপনি সিগারেট খান না বুঝি ?

খাই। তারপরেই আবার তেমনি কান্নার মতো একটা আওয়াজ: আপনি সত্যি সত্যিই আমাকে সিগারেট অফার করছেন ?

হ্যাঁ করছি।

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস।

আপনি শুনে অবাক হবেন যে গত দশবছরে আপনিই আমাকে প্রথম সিগারেট অফার করলেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

বলে লোকটি তেমনি হাত গুটিয়ে বসে রইল।

বললাম, আপনার ধন্যবাদ আমি গ্রহণ করব যদি একটা সিগারেট তুলে নেন।

অনেকক্ষণ পরে কাপড়ের ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে এল। আঙুলগুলো কাঁপছে। কিছুতেই সিগারেটের একটা কোণা ধরে টান দিতে পারছে না। লোকটির অবস্থা দেখে আমি নিজেই একটা সিগারেট বার করে তার হাতে দিলাম। তারপর আরেকটি সিগারেট বার করে ঠোঁটে চেপে দেশলাই বার করলাম পকেট থেকে।

এবার লোকটি যেন একেবারে আর্তনাদ করে উঠল, না, না, দেশলাই জ্বালবেন না। আপনি আমাকে সিগারেট অফার করেছেন, এই তো যথেষ্ট। আপনার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

কথা শেষ হবার আগেই আমি দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দেবার জন্তে লোকটির মুখের সামনে ধরেছি। এবারে আমার আর্তনাদ করে ওঠার পালা। দেশলাইয়ের কাঠির স্বল্প আলোতেও দেখলাম, কুষ্ঠরোগের বীভৎস চিহ্ন লোকটির সারা মুখে। নাক নেই, চোখ গলিতপ্রায়, মুখের জায়গায় জায়গায় দগদগে হয়ে ফুলে ওঠা, এমনকি যে-হাতের আঙুল দিয়ে ও আমার সিগারেটের প্যাকেট হাতড়েছে সেই আঙুলগুলো পর্যন্ত খসে খসে পড়ছে। ওই সিগারেটই আমি আবার মুখে দিয়েছি!

তবুও কিন্তু আমি সেদিন লোকটির সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর নিজের মুখের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে চলে আসছি, শুনতে পেলাম তেমনি কান্নার মতো একটা আওয়াজ—

আপনি চলে যাচ্ছেন!

আমি জবাব দিইনি। সিগারেট চেপে ধরা ঠোঁটদুটো তখন জ্বালা করছিল।

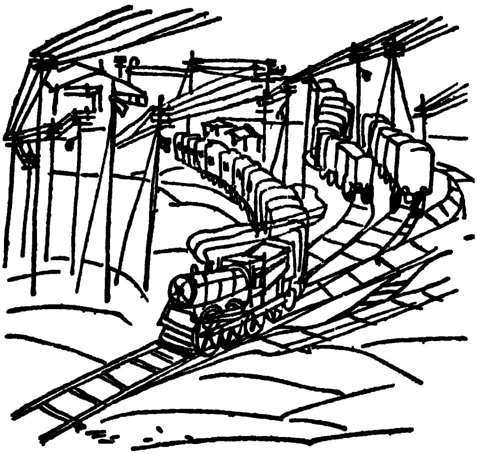
তারপরেও আরো অনেকবার সবুজ পাহাড়ে গিয়েছি। বসেছি সেই পাথরের ওপরেই। কিন্তু সেই লোকটিকে আর কোনোদিন দেখিনি। দিনের আলোয় নগরীর পথেঘাটেও কোনোদিন নয়। একদিন দেখা দিয়েই লোকটি যেন নিঃশেষে মুছে গেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি স্বপ্ন দেখিনি তো? আমি যাকে দেখেছিলাম, সে কি সেই শিল্প-নগরীর রুদ্ধশ্বাস জীবনের রক্তমাংসে গড়া মূর্তি? আমারই মনের চিন্তাকে কি আমি পাশে বসিয়েছিলাম?

এই স্মৃতি-কাহিনী লিখতে বসে আজ মনে হচ্ছে, তা যদি হয়ও তো ক্ষতি নেই। সেই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মূর্তি, মানুষের সঙ্গের জন্তে সেই ব্যাকুলতা, এই ছিল সেখানকার জীবনের চেহারা। এতক্ষণ যাকে শিল্প-নগরী বলেছি, তা ছিল কারা-নগরী। কিংবা হয়তো তার চেয়েও খারাপ। কারণ, কারা-জীবনেও বন্দীরা মানুষের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয় না।

এই কারা-নগরীর কাহিনী দিয়েই শুরু করা যাক।

ইস্পাত ও কংক্রিটের কবিতা



কলকাতা থেকে একশো পঞ্চাশ মাইল। এক্সপ্রেস ট্রেনে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। আমি নিজে বহুবার যাতায়াত করেছি, কিন্তু সেই প্রথম দিনের চমক কো নো দি ন ই কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আজো চোখ বুজে আমি বলে দিতে পারি কোথায় কী আছে। এমনকি লাইনের ধারের গাছপালা মাঠঘাট পর্যন্ত আমার চোখের সামনে সিনেমার ছবির মতো পর-পর ভেসে ওঠে। কিন্তু তবুও সেই প্রথম দেখার বিস্ময় আজো যেন চোখে লেগে আছে। এই শিল্প-নগরী আশ্চর্য একটা কবিতার মতো, অনেকবার পড়ার পরেও নতুন করে পড়ে অবাক হতে হয়।

শেষ জংশন স্টেশন থেকেও ষোলো মাইল দূরে। মাঝে অনেকগুলো ছোট ছোট স্টেশন কিন্তু এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের তা নজরে পড়ে না। দু-পাশে বিরলবসতি অসমতল প্রান্তর। নিষ্ফলা। বড়ো বড়ো গাছের ফাঁক দিয়ে একটা ভাঙাচোরা রাস্তা এঁকেবেঁকে কয়েকবার রেললাইন পারাপার করেছে। দিনের আলোয় এই রাস্তায় 'উর্বশী,' 'মেনকা,' এবং আরো অনেক স্বনামধন্যারা যাতায়াত করে। এগুলো বাসের নাম এবং স্থানীয় লোকের কাছে বাসগুলো এসব নামেই সর্বাধিক পরিচিত। এত খারাপ রাস্তা যে উর্বশী-মেনকারাও এখানে শ্লথগতি—ষোলো মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে সময় নেয় পুরো একঘণ্টা। শুধু উর্বশী-মেনকা নয়,

প্রচণ্ড শক্তিবিশিষ্ট কানাডিয়ান এক্স্-বি ইঞ্জিন লাগানো এক্সপ্রেস ট্রেনও এর চেয়ে কম সময়ে এই একই দূরত্বের রেলপথ অতিক্রম করতে পারে না। বাংলার সমতল থেকে বিহারের উচ্চতায় ঊর্ধ্বগতির সেতুপথ এই ষোলো মাইল বা বিহারের উচ্চতা থেকে বাংলার সমতলে অধোগতি। গতি যেখানে ঊর্ধ্বঃ বা অধঃ সেখানে সর্বক্ষেত্রেই সংযত হতে হয়। কথাটা উর্বশী মেনকার পক্ষেও সত্যি, কানাডিয়ান এক্স্-বি ইঞ্জিনের পক্ষেও। উর্বশী-মেনকাই হোক, বা এক্সপ্রেস ট্রেনই হোক্, এই ধিকিধিকি চলাটাই শেষপর্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। সময়টা যদি সন্ধ্যার পর হয় তবে আরো বিরক্তিকর মনে হয় এজন্যে যে চোখের দৃষ্টিও একই দৃশ্যের আবর্তন দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সিগনালের রক্তচক্ষু ছাড়া আর কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। বড়ো বড়ো গাছপালা আর আদিগন্ত মাঠ। স্টেশনগুলোর পর্যন্ত হদিশ পাওয়া যায় না। যেন আশ্চর্য এক নিশ্চুপ-নির্বাতির দেশ।

তবে হঠাৎ মাঝে মাঝে দেখা যায় যে বাঁ-দিকে আকাশের একটা কোণে যেন আগুন ধরে গেছে। ওটা কুলটি আর বার্নপুরের ব্লাস্ট-ফার্নেসের আভা। এতদূর থেকে কারখানা দেখা যায় না, কারখানা অঞ্চলের কোনো একটা বিচ্ছিন্ন বাতিও না। শুধু সেই আগুন ধরানো আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু কল্পনা করা চলে।

সেই কল্পনারও শেষ আছে। তারপর? তারপর শুধু নিরবয়ব নিরন্ধ্র অন্ধকার। রঙ-রেখাশূন্য তমিস্র ব্যাপ্তি, আর বৈচিত্র্যহীনতার ক্লান্তি।

আর তারপর সেই শিল্প-নগরী। অসংখ্য আলো, অজস্র রঙ আর অপরিসীম ব্যঞ্জনার প্রচণ্ড একটা চমক। স্বপ্ন বলে মনে হয়, চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। এত আলো? এত ঝল্‌মলে কোঠাবাড়ি? এমন আশ্চর্য জ্যামিতিক বিন্যাস? আলাদিনের প্রদীপ হাতে পেয়েছে নাকি কেউ?

প্রথম দেখাটা রীতিমত একটা সারপ্রাইজ।

গোটা প্রোজেক্টই একটা সারপ্রাইজ। সারপ্রাইজ নগর পরিকল্পনায়, সারপ্রাইজ

স্টাফ-কোয়ার্টারে, সারপ্রাইজ বিরাট কারখানার শেডে শেডে, ইলেকট্রিক বাতির অজস্রতায়, নগর-ব্যবস্থাপনার ক্রটিহীন আয়োজনে। আশ্চর্য একটা কবিতা যেন—ইস্পাত আর কংক্রিটের কবিতা।

স্টেশনের নাম পর্যন্ত পাল্‌টে গেছে। রেল-লাইনের অন্য পাশের লোকালয় অবশ্য এখনো আগেকার সেই গ্রাম্য ঘরোয়া নামেই খ্যাত। ওদিকটায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। পাতার ছাউনি দেওয়া বস্তি আর ভাঙা কোঠাবাড়ি। অমার্জিত রাস্তা। চোখধাঁধানো ইলেকট্রিক বাতির পাশে হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো আপন কৌলীন্যে কোনো রকমে অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রেখেছে মাত্র। এই অঞ্চল বিহারের অন্তর্গত।

স্টেশনের এদিকে পিচবাঁধানো রাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে পথনির্দেশক বোর্ড আছে, তবুও বিহার ডিঙিয়েই যেতে হবে। যেখানে বিহার শেষ আর বাংলা শুরু, প্রোজেক্টের শুরুও সেখানে। এই দুই প্রদেশের সীমানায় ব্যারিয়ার গেট। এখানে সিকিউরিটি পুলিস পাহারায় থাকে। ভিতরের লোক বাইরে আসবার সময় আইডেন্‌টিটি কার্ড নিয়ে আসে, বাইরের লোককে ভিতরে ঢুকতে হলে সিকিউরিটি অফিসারের অনুমতিপত্র চাই।

এই ব্যারিয়ার গেট থেকে সোজা একটা রাস্তা প্রোজেক্টের ভিতরে ঢুকেছে। এই রাস্তার বাঁ দিকে আরো দুটো সমান্তরাল রাস্তা আছে। এই তিন রাস্তায় সবচেয়ে উঁচু মাইনেওয়ালারা থাকে। জেনারেল ম্যানেজার থেকে শুরু করে ফোরম্যান পর্যন্ত। বাংলো আর 'ডি'-টাইপ বাড়ি। অফিসারদের ক্লাবও এই পাড়াতেই। এই এলাকাকে এখানকার বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে বলে—অফিসার্‌স্‌ কলোনী। সাধারণ লোকে বলে—সাহেবপাড়া।

সাধারণ লোকের এই নামকরণকে মেনে নিলে প্রোজেক্টের অন্যান্য পাড়াকেও বিশেষ এক-একটা নামে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, বাবুপাড়া, কেরানিপাড়া, কারিগরপাড়া, মজদুরপাড়া।

বাবুপাড়ায় অধিকাংশই 'সি' টাইপ বাড়ি। বড়বাবু আর সিনিয়র সাবর্ডিনেটরা

থাকে। অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে একেকটা রাস্তার নাম—এক, দুই, তিন, চার। একমাত্র সাহেবপাড়ার তিনটি সমান্তরাল রাস্তা বাদ দিয়ে আর কোথাও রাস্তার কোনো নাম নেই। পর পর অঙ্কের সংখ্যা চলেছে। বাবুপাড়ায় এক শুরু হয়ে মজদুরপাড়ায় শেষ রাস্তা সত্তরে এসে পৌঁছেছে। বাবুপাড়া শেষ হয় আট-এ। নয় থেকে কেরানিপাড়া, কুড়ি থেকে কারিগরপাড়া, চল্লিশ থেকে মজদুরপাড়া।

কেরানিপাড়ায় অধিকাংশই 'বি' টাইপ বাড়ি। মজদুরপাড়ায় 'এ' টাইপ। শুধু কারিগরপাড়াটাই ব্যতিক্রম। এখানে 'এ' থেকে' 'ডি' পর্যন্ত সমস্ত টাইপের বাড়িই আছে। একেবারে শেষ সীমানায় 'এ' টাইপ বাড়ি, তারপর 'বি', আর একেবারে সামনের দিকে শুরুতেই 'ডি' টাইপ। এই এলাকার বাসিন্দারা কারখানার কর্মচারী—ফিটার, মিস্ত্রী, ইত্যাদি।

বাবুপাড়া আর কেরানিপাড়া ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেলেই জেনারেল ম্যানেজারের আপিস বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্‌ডিং। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি, সামনে লন্‌ আর কৃত্রিম ঝরনা।

এই বাড়ির আশেপাশে এমনি আরো কতকগুলো দোতলা বাড়ি। কোনোটায় রিসার্চ ল্যাবরেটরি, কোনোটায় বা টেক্‌নিকাল স্কুল, কতকগুলোতে হোস্টেল। জেনারেল ম্যানেজার ছাড়াও প্রত্যেক বড়ো বড়ো অফিসারের এক-একটি বড়ো বড়ো আপিস আছে। যেমন চীফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, ডিস্‌ট্রিক্ট ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, ডিস্‌ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার, ডিস্‌ট্রিক্ট কন্‌ট্রোলার অব স্টোর্স, ইত্যাদি। সিনিয়ার সাবর্ডিনেট পর্যায়ের কর্মচারীদের ক্ষুদে আপিসের সংখ্যাও কম নয়।

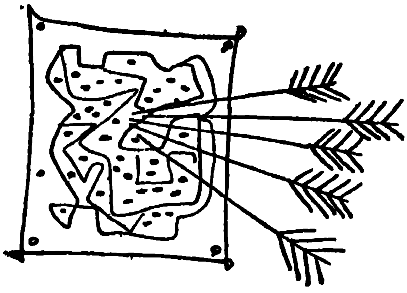
জেনারেল ম্যানেজারের আপিসের ঠিক পেছন থেকেই প্রকাণ্ড একটা এলাকা জুড়ে কারখানা শুরু। কারখানাকে বেড় দিয়ে দু-পাশে দুই পিচের রাস্তা অনেকটা যাবার পরে একসঙ্গে মিশেছে, সেই জায়গার নাম মজদুরপাড়া; 'এ' ও 'বি' টাইপ বাড়ি। কুলি-খালাসীরা থাকে।

কেরানিপাড়া ও কারিগরপাড়ার মাঝখানে আছে হাসপাতাল। হাসপাতালকে ঘিরে হাসপাতাল কর্মচারীদের জন্যে 'এ' থেকে 'ডি' টাইপ পর্যন্ত কোয়ার্টার।

এই হচ্ছে মোটামুটি প্রোজেক্টের চেহারা। সাহেবপাড়া, বাবুপাড়া. কেরানিপাড়া, কারিগরপাড়া ও মজদুরপাড়া। বাংলো-ডি-সি-বি-এ। বিভিন্ন কলোনী ও কোয়ার্টারের বিন্যাস ও অবস্থানের মধ্যে ভয়ংকর একটা পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয়। সে-কথা যথাসময়ে বলব। কিন্তু প্রথম কয়েক দিনের অবস্থানে আপাতদৃষ্টিতে যেটুকু চোখে পড়েছিল তাতে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার মাইনের কর্মচারীদের জন্যে 'এ' টাইপ কোয়ার্টারে পর্যন্ত দুটি প্রশস্ত ঘর, ইলেক্ট্রিক বাতি, পৃথক কল-পায়খানা এবং সামনে-পেছনে বাগান করবার জন্যে টুকরো জমি। কোয়ার্টারের টাইপ ধাপে ধাপে যতো উঁচু দিকে উঠেছে তার পরিধি আর পরিসরও ততো বেড়েছে। এ ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় আছে প্রাইমারী স্কুল, ডিসপেন্‌সারি আর ছেলেমেয়েদের জন্যে পার্ক। তিনটি বড়ো বড়ো খেলার মাঠ। ছেলেদের ও মেয়েদের জন্যে দুটি পৃথক হাইস্কুল। ক্লাব ও লাইব্রেরি। সন্ধ্যার পর সারা প্রোজেক্ট আলোয় ঝলমল করে ওঠে। কোথাও ফ্লুয়োরেসেণ্ট টিউব, কোথাও ফ্লাশলাইট আর সেই সবুজ পাহাড়ের ওপরে আকাশের তারার মতো সবুজ আলো। ইস্পাত আর কংক্রিটের কবিতাকে রাত্রিবেলা মনে হয় যেন দীপান্বিতার আরতি।

কারখানা যেন বিশ্বকর্মার কর্মশালা। স্মিদি শপে বড়ো বড়ো ষ্টিমহামারের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে মাটি থর থর করে কাঁপে, ফাউণ্ড্রি শপের গলানো লোহার উত্তাপে বাতাস ঝলসে যায়, ওয়েলডিং শপে তীব্র অক্সি-অ্যাসিটেলিন শিখায় অন্ধ হয়ে যায় চোখের দৃষ্টি। হেভি মেশিন শপ, লাইট মেশিন শপ, টুল রুম। লেদ আর ড্রিলিং মেশিন, নাট-বোল্ট থেকে শুরু করে পিস্টন-রড পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রের সঙ্গে তাল রেখে আগুনের ফুলকি ছিটকে ছিটকে আসে, আগুনে তাতানো লাল লোহা উল্‌কার মতো ছুটে বেরিয়ে যায়। ইরেক্টিং শপ

আর বয়লার অ্যাসেম্বলিতে দৈত্যের মতো এক একটি যন্ত্র, মস্ত বড়ো বড়ো ক্রেন আর রেল ট্র্যাকের ওপর দাঁড়-করানো ইঞ্জিন—কোনোটায় কাজ শেষ হয়েছে, কোনোটায় পুরো দমে কাজ চলেছে, কোনোটায় সবেমাত্র শুরু। এমনি শেডের পর শেড। প্যাটার্ন শপ, ব্রাস ফাউণ্ড্রি, বয়লার কন্‌সট্রাক্‌শন, ক্রেম অ্যাণ্ড টেণ্ডার, কপার স্মিদি, হুইল। বিচিত্র যন্ত্র, বিচিত্র লোকজন, বিচিত্র কর্মব্যস্ততা। প্রথম দেখাটা রীতিমত একটা সারপ্রাইজ।



এই প্রথম চমকের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে ওঠা বাইরের লোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্তত প্রথম কয়েক দিন আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এতদিনে আমাদের দেশে একটা সত্যিকারের শিল্প-প্রচেষ্টা রূপ-পরিগ্রহ করেছে।

কলকাতা থেকে একদল সাহিত্যিক সরকারী আমন্ত্রণে এসেছিলেন এই প্রোজেক্ট দেখতে। ছ-ঘণ্টা সময় তাঁরা ছিলেন এখানে। বাসে চেপে ঘুরেছিলেন সারা প্রোজেক্টে। ভূরিভোজন ও চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়েছিল তাঁদের। জেনারেল ম্যানেজার নিজে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা করেছিলেন। ফিরে গিয়ে তাঁরা নিজেদের ধারণা ও মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন কলকাতার বিভিন্ন সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়। সে-সব লেখার মূল কথা এই: এমন এক কল্পনাতীত বিস্ময় প্রত্যক্ষ করতে পেরে সাহিত্যিকরা ধন্য হয়ে গেছেন, ভাগিরথীর মর্ত্যে আগমনের মতো এই শিল্প-উদ্যোগও অজস্র ধারায় দেশের মৃত প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করে তুলবে।

আমার কথা, বা আমার মতো বাইরের লোকের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। এমনকি যারা এখানকার স্থানীয় লোক, প্রোজেক্টের নির্মাণকার্য শুরু হবার পর যারা জমি থেকে উৎখাত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, এবং অবশেষে পেটের ধান্দায় আবার এখানে এসেই দিনমজুরি করছে, তিন বছর ধরে দিনের পর দিন চোখের ওপর একটু একটু করে গুড়ে উঠতে দেখেছে এই বিরাট

নগরীকে, তারাও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কোথায় গেল সেই গোবর-নিকানো তকৃতকে পল্লী-কুটির? কোথায় সেই মহুয়া আর পলাশ গাছ?

বিরূপাক্ষকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহুয়া গাছ ছিল নাকি এখানে?

না কেনে? হুই হোথা।

প্রতিটি জায়গা এদের মনে আছে। একটি দুটি মহুয়া গাছ? নিবিড় এক বেষ্টনী। তার মধ্যে একটি গাছ আজও দাঁড়িয়ে আছে অতীতের স্মৃতি নিয়ে। সাহেবপাড়ায় ডিস্ট্রিক্ট ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে এই গাছটি। জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা, টেলিফোনের তার নেবার জন্যে বড়ো বড়ো কয়েকটি ডাল কেটে ফেলা হয়েছে। অতীতের কংকাল। কিন্তু এই কংকালের মধ্যে অতীতের সেই প্রাণবন্ত উচ্ছল রূপের আভাসটুকুও নেই। ইস্পাত ও কংক্রিটের কবিতা মহুয়াগাছের প্রাণরস শুষে নিয়েছে।

আর পলাশের চিহ্নমাত্র নেই। আগুন-রঙা পলাশ ফুলে যেখানকার আকাশ লাল হয়ে থাকত সেখানে এখন সেণ্ট্রাল পাওয়ার হাউস। ডি-ভি-সি থেকে এগারো কিলোভোল্ট সাপ্লাই আসে। বড়ো বড়ো ট্রান্স্ফর্মার, মাথার ওপরে সাইরেন। ভোর ছটার সময় এই সাইরেনের হুংকার শুনে সারা প্রোজেক্টের লোক জেগে ওঠে। কোথায় সেই পলাশ ফুল? কিন্তু এখনো আয়রন ফাউণ্ড্রির ফারনেস খুললে সেণ্ট্রাল পাওয়ার হাউসের পেছন দিককার আকাশে লাল রঙের ছোপ ধরে।

উঁচু-নিচু পাহাড়, রুক্ষ অনুর্বর জমি। মোরগ আর শুয়োরের পাল চরে বেড়াত এখানে। খোঁপায় পলাশ ফুল গোঁজা সাঁওতালি মেয়েরা রশি টেনে টেনে জল তুলত কুয়ো থেকে। মাদল বাজত সন্ধ্যার সময়।

তারপর একদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে জমিদারের খাস জমি সরকারী সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। চীফ ইঞ্জিনিয়ারের তাঁবু পড়ে, বুলডোজার আসে সারি সারি। আর আসে ঠিকাদাররা। লোলুপ দৃষ্টি পড়ে সাঁওতাল মেয়েদের

ৰূপপাবিদ্ধ নিটোল দেহের ওপর। সেই ক্লেদাক্ত ব্যভিচারে ইস্পাত আর কংক্রিটের কবিতার ভ্রূণসৃষ্টি।

ছুই হোথা।

আম আর কাঁঠালগাছ ঘেরা জমির ওপরে এখনো সেই অস্থায়ী কুটিরটিকে রেখে দেওয়া হয়েছে। এখানে একদিন সাঁওতালদের তীর ছুটেছিল। প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিল চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে। মাদলের বোলে চাপা পড়ে গিয়েছিল বুলডোজারের গর্জন।

এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় বিরূপাক্ষের মুখে আমি সেই অতীত দিনের কাহিনী শুনেছিলাম। সেদিনও এমনি সাবা দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। তবে এখানকার উঁচু-নিচু পাথুরে জমিতে অতিবর্ষণেও কাদা হয় না। বরং মাটির ওপরকার দীর্ঘ-সঞ্চিত ধুলোর স্তর সরে গিয়ে মনে হয় যেন মাটির রঙ ফিরে এসেছে. দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর নতুন স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার মতো। তখন সবেমাত্র জরিপের কাজ শুরু হয়েছে এবং দু-একটা পাহাড়কে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। বড়ো বড়ো গাছগুলো তখনো অক্ষত। ঠিকাদারের লোকজন সন্ধ্যা হতে না হতেই ষোলো মাইল দূবের জংশন শহরে চলে যায়। তারপরে আম-বাগানের মধ্যে অস্থায়ী কুটিবের টিমটিমে আলোটুকু ছাড়া দিনের কর্মব্যস্ততার আর কোনো চিহ্নই থাকে না।

জনা পঁচিশেক সাঁওতাল এক একটা বড়ো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই টিমটিমে আলোকে লক্ষ্য করে বিষ-মাখানো তীর ছুঁড়েছিল।

সাঁওতালদের তীর সাধারণত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু সেদিন এমনই যোগা-যোগ যে ঠিক সন্ধ্যার পরেই জরুরী ট্রাঙ্ককল পেয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার সদলে হেড-কোয়ার্টারের দিকে রওনা হয়ে গেছেন। ফাঁকা ঘরে আলো জ্বলছিল।

পরদিন ফিরে এসে তিনি দেখেন যে দেয়ালজোড়া ব্লু-প্রিণ্টটা চালুনির মতো ঝাঁজরা হয়ে গেছে। আলাদা আলাদা করে গুণে দেখা হয়েছিল। সবসুদ্ধ দু-শো দশটা তীর বেঁধার চিহ্ন। অধিকাংশই দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে মেঝেতে

পড়ে গেছে। কয়েকটা তখনও বিঁধে আছে উদ্যত আতঙ্কের মতো। এই ব্লু-প্রিন্টের একটা ফটো আমি দেখেছি। হঠাৎ মনে হয় যেন তারা-ছিটানো আকাশের প্রতিচ্ছবি। আর সারা আকাশ জুড়ে বিরাট এক কালপুরুষ তীর-ধনুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

ইস্পাত আর কংক্রিটের কবিতার জন্মলগ্নে সাঁওতালদের এই অপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম আজ বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী। কিন্তু সেদিন সেই ঘটনা একটা হঠাৎ-আসা ঝড়ের মতো সমস্ত সরকারী আয়োজন তছনছ করে দিয়েছিল। তলোয়ার নিয়ে জমিদারকে কাটতে গিয়েছিল সাঁওতালরা। আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল জমিদারের বাড়িতে। বুলডোজার থামিয়ে কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে দূরে সরে যেতে হয়েছিল ঠিকাদারদের। ষোলো মাইল দূরের জংশন শহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন চীফ ইঞ্জিনিয়ার। তারপর আসে রাইফেলধারী সেপাই। বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করে বুলডোজারের পথ পরিষ্কার করা হয়। এইভাবে বুলেট আর বুলডোজারের ছন্দে ইস্পাত আর কংক্রিটের কবিতা স্তবকে স্তবকে গাঁথা হয়েছে। এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের অনেকে আজো এখানে কুলি-কামিনের কাজ করে। খোঁপায় গোঁজা পলাশ ফুল আর নেই, সে-জায়গা নিয়েছে প্ল্যাস্টিকের তৈরী কুঁড়িস্তবক। মহুয়া ফুলের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা গন্ধের বদলে গ্রীজ আর গ্যাসোলিনের উগ্র আধুনিকতা। সাইরেনের ধমকে মাদলের বোল স্তব্ধ।

কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে—হুই হোথা।

ওখানেই একদিন জমিদার-বাড়ির আগুনে আকাশ লাল হয়ে উঠেছিল। আর এখনো মাঝে মাঝে ওইদিককার আকাশ লাল হয়ে যায়। কুলটি আর বার্ন-পুরের ব্লাস্ট-ফারনেসের আভা।

হুই হোথা!

এগারো কিলোভোল্টের হাই-টেন্সন তার ইন্সুলেটরের গায়ে পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে। আগুন-রঙা পলাশ ফুলে একদিন ওখানকার আকাশ লাল হয়ে

থাকত। আর এখনো আয়রন-ফাউণ্ড্রির ফারনেসের আভায় ওখানে আগুনের ছোপ ধরে।

হুই হোথা!

উঁচু-নিচু পাহাড়। রুক্ষ অনুর্বর জমি। সূর্যের আলোয় ইলেকট্রিকের তামার তার ঝলসে ওঠে। তামার তার না আগুন ঝল্‌সানো তীর? এখানে সাঁওতালদের তীর ছুটেছিল একদিন।

বুলডোজারের গ্রাস



সাঁওতাল উৎখাতের জন্যে ফৌজী বীরত্বপনার বলি ক-জন, সে-ইতিহাস কোথাও নেই। এমন কি এই ইতিহাস সংগ্রহের সম্ভাব্য উপকরণও নিঃশেষে মুছে ফেলা হয়েছে। বরং প্রোজেক্টের প্রচারদপ্তরে এমন ছবিও নাকি আছে যে সাঁওতাল মেয়েপুরুষ ফুলের মালা হাতে নিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে স্বাগত জানাচ্ছে। ভারত সরকারের প্রচার-দপ্তর থেকে এই প্রোজেক্টের একটি ডকুমেণ্টারি ছবি তোলা হয়। তাতেও প্রাক্-প্রোজেক্টের দৃশ্যে জনবসতির বিরল চিহ্ন। আর এমন দৃশ্য ছিল যে সুবেশ সোৎসাহ সাঁওতাল মেয়েপুরুষ আড্ডা-ইয়ার্কি মারতে মারতে মাটি কোপাচ্ছে। মাটি তারা কুপিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সাত পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে তারপর সেই মাটিতেই ইস্পাত আর কংক্রিটের গাঁথুনি তোলবার জন্যে কোদাল চালাতে চালাতে সমস্ত বুক-নিংড়ে কি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসেনি ?

এই বুক-নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাসেরই একটি কাহিনী। আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা।

এখানে টেলিফোনের কাজ শুরু হয়েছে আমি আসার পরে। আমার

তত্ত্বাবধানেই টেলিফোনের কাজ হচ্ছিল। তার আগে টেলিফোন বলতে ছি কোনো রকমে খুঁটি গেড়ে টেনে আনা দুটো ট্রাঙ্ক-লাইন। স্থানীয় খবরাখব লোক মারফত চলাচল করত।

সে-সময়ে অন্যান্য নির্মাণকার্য মোটামুটি শেষ হয়েছে। শুধু বাবুপাড়ার শে প্রান্তে কয়েকটা 'বি' টাইপ 'হলো বাঘ' কোয়ার্টার তৈরি হচ্ছিল। 'হলো বাঘ' মানে 'হলো ব্লক'—লোহার জালে কংক্রিট-জমানো মস্ত বড়ো বড়ে একেকটা ইট, ভেতরটা ফাঁপা। মাটি পোড়ানো নিরেট ইটের চেয়ে এই কংক্রিট জমানো ফাঁপা ইটে খরচ অনেক কম, গাঁথুনি তুলতেও অনেক সুবিধে। কিন্ত যারা এসব কোয়ার্টারে বাস করতে আসে তারা 'হলো-বাঘের' দাপট হাড়ে হাড়ে টের পায়—গরমকালে যেমন গরম, শীতকালে তেমনি শীত, আর মাঝে মাঝে গোটা বাড়িটাই কেমন যেন একটা শিস্ দেওয়ার মতো শব্দ তুলে হিস হিসিয়ে ওঠে।

টেলিফোনের কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রোজেক্ট জুড়ে মাটির নিচে টেলিফোনের কেব্‌ল পাতা শুরু হয়। চার ফুট গভীর স্লিট্‌ ট্রেঞ্চ, তার মধ্যে পুর করে বালি ঢেলে সেই বালির বিছানার ওপর দিয়ে কেব্‌ল নিয়ে যেতে হবে তারপর আবার বালি ঢেলে ইট সাজিয়ে মাটি চাপা দেওয়া। বারোজন লোকে একটা কুলি-গ্যাঙ এই কাজে নিযুক্ত ছিল। দেড় টাকা রোজ, চারটে রবিবা বাদ দিয়ে মাসে ছাব্বিশ দিন কাজ। অর্থাৎ সারা মাসে উনচল্লিশ টাকা এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট খাবার ছুটি নিয়ে সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচট পর্যন্ত কাজ।

এই কুলি-গ্যাঙে কাজ করত রামেশ্বর নামে একটি সাঁওতাল পুরুষ। জোয়া তাগড়া চেহারার লোকটা কিছুতেই যেন ক্লান্তিবোধ করে না। শক্ত পাথুরে জমিতেও দিনে দশ ফুট ট্রেঞ্চ কাটতে পারে। তখন সময়টা ছিল বৈশাখ মাস থার্মোমিটারের পারা অবশ্য একশো-ছয়ের ওপরে ওঠে না, কিন্তু রৌদ্রের তা অসহ, আর আগুনের হল্‌কার মতো একটা গরম বাতাস সারা শরীর ঝলসিয়ে

পুড়িয়ে দিয়ে যায়। শুকনো গরমে ঘাম হয় না, কিন্তু তীব্র একটা জ্বালাবোধ শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে ঘামের মতো বেরিয়ে আসে যেন।

শক্ত মাটিতে মাঝে মাঝে কোদাল চলে না। তখন গাঁইতি। ঝক্‌ঝকে ফলাটা সূর্যের আলোয় ঝল্‌সে উঠে অর্ধবৃত্তাকারে নেমে আসে, মানুষটার সারা শরীর দুমড়ে-মুচড়ে চাপা মেঘগর্জনের মতো একটা শব্দ হয়, আগুনের ফুল্‌কি ছিটকে আসে।

আর তারপরেও ক্ষণস্থায়ী বিশ্রামের অবকাশে বিড়ি আর চুটা টানতে টানতে হাসাহাসি করে লোকগুলো। মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ে, থমথমে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে আদিগন্ত প্রান্তরের দিকে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

জমি দিবেক্ না কেনে? কেনে? আঁ—?

এই জমিতে কারখানা বসালে সরকারের যদি সুবিধে হয় তো হোক, কিন্তু তারা কেন অন্য কোথাও বদ্‌লি জমি পাবে না! কেন? এত দিনেও এই কথাটা তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনি। অনেক দিনের জমে-থাকা প্রশ্নটা আচমকা দু-একজনের মুখ দিয়ে আক্রোশে ফেটে পড়ে। তারপরে গাঁইতির ফলা দিয়ে ঠন্ করে পাথুরে জমিতে ঘা দেয়। আগুনের ফুল্‌কি ছিটকে আসে।

আর কত জিনিস যে বার হয় মাটির নিচে থেকে। বুলডোজারের চাপে গুঁড়িয়ে যাওয়া গৃহস্থালির চিহ্নাবশেষ। উনুনের শিক থেকে সিঁদুরের কৌটো পর্যন্ত।

অহল্যার কান্না



মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একদিন বেরোয় লোহার একটা বলয়। রামেশ্বরের কোদালেই ঠুন্ করে ঠেকেছিল। জিনিসটা কতকাল মাটির তলায় আছে কে জানে, কিন্তু আশ্চর্য, একটুও মরচে পড়েনি বা বিকৃত হয়নি। সধবা মেয়েদের হাতের নোয়ার মতো, বিচিত্র কারুকার্য করা।

জিনিসটা তুলে নিয়ে রামেশ্বর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। কে একজন ঠাট্টা করে বলে ওঠে, ওটা বৌয়ের লেইগ্যা নিয়া যা রামেশ্বর।

হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়, জোয়ান ভাগড়া লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে।

আমার ছেইল্যা! আমার ছেইল্যা!

লোহার বলয়টা দেখে ছেলের কথা মনে পড়েছে রামেশ্বরের।

বছর তিনেক আগে এমনি এক দিনে রামেশ্বর গিয়েছিল হাটে—রামেশ্বরের বৌ গিয়েছিল ভাঁটিখানার পাশে কুয়ো থেকে জল আনতে। আট মাসের বাচ্চা শিশুকে কাঁথা মুড়ি দিয়ে দাওয়ার একপাশে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে বুলডোজার চালিয়ে সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। মাটির ওপরে একটি লাল রঙের ছোপও পড়েনি। আট মাসের কচি হাড়ের একটা টুকরোও খুঁজে পাওয়া যায়নি কোথাও।

ঘটনাটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু এ-ধরনের ঘটনা সে সময়ে ঘটেছে। ঠিকাদারের লোকেরা এসে প্রথমে শাসাত আর ভয় দেখাত। তারপর সাঁওতালরা রুখে দাঁড়ালে পালিয়ে যেত ভয়ে। তারপর সুযোগ বুঝে অলক্ষ্যে এসে ঘরবাড়ি মিশিয়ে দিয়ে যেত মাটির সঙ্গে।

সাক্ষী প্রমাণ চাইলে দেওয়া যাবে না। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও নেই। চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের কন্‌ফিডেনশিয়াল রিপোর্টেও এই ঘটনা অনুল্লিখিত। শুধু রামেশ্বরের কান্নাবিকৃত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে আর শুনতে হবে তার আর্ত চিৎকার : আমার ছেইল্যা! আমার ছেইল্যা!

অনাবাদী জমিতে যখন ট্রাক্টর চলে তখন যেমন আশ্রয়দায়িনী মাটির ফাটলে ফাটলে অদৃশ্য এক সরীসৃপ-জগতে সংহারের ধ্বংসলীলা নামে. তেমনি এই প্রাচীন সাঁওতাল-বসতি এক আধুনিক শিল্প-উদ্যোগের ট্রাক্টরের ফলায় অত্যন্ত নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে টুকরো টুকরো হয়েছিল।

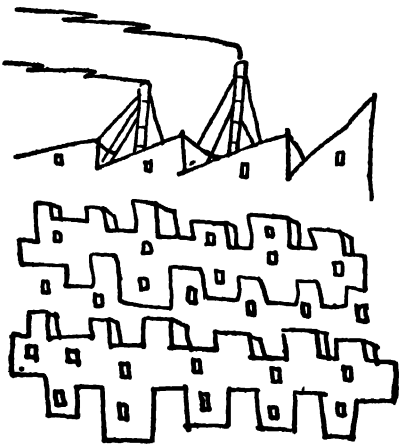
আজো মাঝে মাঝে সারা প্রোজেক্‌টের ওপর দিয়ে একটা কান্নার গোঙানি ভেসে ভেসে বেড়ায়।

বাংলো-ডি-সি-এ— সবাই শোনে এই কান্না। অফিসারদের বৌরা প্রথমে ভয় পেয়েছিল। পরে তাদের বোঝানো হয়েছে যে টেলিফোন বা ইলেকট্রিকের তারে বাতাসের ধাক্কা লেগে এ-ধরনের শব্দ হয়।

'এ' টাইপের লোকেরা বলে, অহল্যার কান্না।

পাষাণী অহল্যা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্যে কাঁদছে।

নির্মোক



কারখানার এক ফোরম্যানের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আমার আলাপ হয়েছিল। এখানে চাকরি নিয়ে আসার কিছুদিন পরে একবার মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে কলকাতা থেকে ফিরছি—সেই সময়ে ঘটনাটি ঘটে। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার হাওড়া থেকে ছাড়ে রাত সাড়ে ন-টার সময় আর এখানে এসে পৌঁছয় ভোরবেলা। আর এই ট্রেনে ইণ্টার ক্লাসে বিশেষ ভিড় হয় না—সারা রাত ঘুমিয়ে আসা চলে।

একটি মাঝারি গোছের ইণ্টার ক্লাস কামরায় আমি আসছিলাম। শ্রীরামপুর পার হতেই দেখা গেল কামরায় মাত্র দুজন আছি—আমি ও আরেকজন ভদ্রলোক। তিনি একপাশের বাঙ্কে পরিপাটি করে বিছানা করেছেন—শ্রীরামপুর পার হতেই শোবার উদ্যোগ করলেন। ভদ্রলোকের অল্প বয়স, সবেমাত্র কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছেন হয়তো। পরনে খাকি ট্রাউজার ও সাদা শার্ট। হাতে ঘড়ি, পকেটে ফাউণ্টেনপেন, পায়ে ফিতেবাঁধা জুতো। দেখে মনে হয়, সারা পৃথিবীর দিকে খুশির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন।

বিছানায় পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাবেন?

আমি গন্তব্যস্থলের নাম করলাম।

শুনে উল্লসিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন, বাঃ, তাহলে তো আমরা একই জায়গার যাত্রী দেখছি।

কিছুক্ষণ পরে স্যুটকেসটাকে মাথার নিচে রেখে ভদ্রলোক আবার আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, খুব সাবধান মশাই, এ-ট্রেনে কিন্তু ভয়ানক চোরের উপদ্রব। পা থেকে জুতো পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়—টেরটি পাবেন না।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক ইতিমধ্যে তাঁর হাতের ঘড়ি ও পকেটের ফাউন্টেনপেন স্যুটকেসের মধ্যে ভরেছেন। পায়ের জুতো আঁট করে ফিতে বাঁধা। আর স্যুট্‌কেসটাকে এমনভাবে বালিশ করেছেন যে কারও সাধ্য নেই তাঁর মাথা না সরিয়ে স্যুটকেসটাকে টেনে নিতে পারে। ভদ্রলোকের এতবেশি সতর্কতা দেখে আমার হাসি পেল।

তারপর মনে আছে, মাঝরাতে কোন্ একটা স্টেশন থেকে আরেকজন যাত্রী আমাদের কামরায় উঠেছিল। অত্যন্ত নিরীহ চেহারার একটি লোক, মাঝ-বয়সী। সারা কামরাটাই প্রায় খালি পড়েছিল। লোকটি উঠে এককোণে গুড়িসুড়ি দিয়ে বসে রইল। আমার সহযাত্রী চোখদুটোকে ঘোঁচ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন লোকটিকে।

কখন আমার চোখ বুজে এসেছিল মনে নেই। ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ভদ্রলোকের চিৎকারে।

আমার স্যুটকেস! আমার স্যুটকেস!

দেখলাম, ভদ্রলোকের মাথার তলায় সেই নতুন ঝকঝকে স্যুটকেসটা নেই। তৃতীয় যে যাত্রীটি কামরায় ছিল, সেও অদৃশ্য।

ভদ্রলোকের সেই মুহূর্তের চেহারা ভুলবার নয়। এতক্ষণ যে চোখের দৃষ্টি থেকে খুশি ঝরে পড়ছিল তা বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত ব্লটিং দিয়ে শুষে নিয়েছে কে যেন। মাথায় হাত দিয়ে ভদ্রলোক বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে একটু সামলে ওঠার পরে ভদ্রলোককে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার স্যুটকেসের মধ্যে কী ছিল?

ভদ্রলোক বললেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে !

অনেক টাকাপয়সা ছিল বুঝি ?

চোখ তুলে একবার তাকালেন তিনি। তারপর বললেন, আমার যে জিনিস খোয়া গেছে তার কাছে টাকাপয়সা কিছুই নয়।

পরে জানলাম, ভদ্রলোক মুষড়ে পড়েছেন নতুন সুটকেসটির জন্যে নয়, সুটকেসের ভেতরকার তিন সেট গরম সুটের জন্যে নয়, ঘড়ি ফাউণ্টেনপেনের জন্যে নয়, পঞ্চাশটা নগদ টাকার জন্যে নয়—ভদ্রলোকের কাছে এসবের চেয়েও মূল্যবান সম্পত্তি হচ্ছে বি-ই ডিপ্লোমা ও কয়েকটি প্রশংসাপত্র।

ভদ্রলোক বললেন, বি-ই ডিপ্লোমার কপি আবার হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু প্রশংসাপত্র তিনটি সারা-জীবনের মতো খোয়া গেল। যাঁরা প্রশংসাপত্রদিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ-ই আর বেঁচে নেই।

ভদ্রলোকের নানা অসংলগ্ন কথা শুনতে শুনতে বাকি রাতটুকু আমাকে জেগেই যেতে হয়েছিল।

কিছুদিন পরে ইরেক্‌টিং শপের ফোরম্যানের বাড়িতে টেলিফোন লাগাতে গিয়ে দেখলাম, আমার পূর্ব পরিচিত সহযাত্রীটি হচ্ছেন ইরেক্‌টিং শপের ফোরম্যান।

আমাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, আরে আপনি !

আমি বললাম, কী আশ্চর্য !

ভদ্রলোক আমাকে চা খাওয়ালেন এবং চায়ের টেবিলে বসে তাঁর সঙ্গে অনেক-ক্ষণ গল্প হল।

কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কারখানার ভেতরটা ভালো করে দেখেছেন ?

না।

দেখে আসুন। সত্যি এক আশ্চর্য ব্যাপার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্‌টা আশ্চর্য ব্যাপার ? যে অঞ্চলে শিল্প বলতে কিছু ছিল না সেখানে এতবড়ো একটা কারখানা হয়েছে—সেটা ? না, কারখানার

ভেতরে সবচেয়ে হাল আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে বিপুল উৎপাদন শুরু হয়েছে—সেটা?

হেসে উঠে ভদ্রলোক বললেন, দুটোই।

তার মানে?

মানে তো সহজ। এই সরকারী শিল্পোদ্যোগ দেশের চেহারা পাল্‌টে দিয়েছে-একথাও ঠিক। আবার এটা যে নেহাতই লোক-দেখানো ব্যাপার, আসলে এখনো পর্যন্ত কিচ্ছু না—তাও ঠিক।

আমি বললাম, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

ভদ্রলোক বললেন, প্রথম কথাটা বুঝিয়ে বলার দরকার করে না। পরিকল্পনার দিক থেকে এই শিল্পোদ্যোগ এত বিরাট ও অভিনব যে এ নিয়ে যে-কোনো দেশ গর্ব করতে পারে। শুধু এই একটি শিল্পের কথা বলছি না। দামোদর বাঁধের চারপাশে একাধিক শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছে এবং সব মিলিয়ে যে চিত্র তা আমাদের দেশের পক্ষে গর্বের বস্তু।

বলতে বলতে ভদ্রলোক হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তারপরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, এত বড়ো কারখানা! কী না হতে পারত এখানে। কিন্তু সামান্য কয়েকটা নাট-বল্‌টু ছাড়া আর কিছুই তৈরি হয় না। কী ব্যাপার জানেন? হয়তো আমরা এই কারখানায় পিস্টন তৈরি করলাম, কিন্তু তার সকেট আসবে বিলেতের কারখানা থেকে। পরে দেখা যাবে পিস্টনের সঙ্গে সকেটের মাপ মিলছে না। তখন আমাদের তৈরি পিস্টন বাতিল হয়ে যাবে আর দুটো জিনিসই আসতে শুরু করবে বিলেতের কারখানা থেকে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি বলছেন কী।

যা ঘটছে, তাই বলছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোক আবার বললেন, ট্রেনের সেই চুরির কথা আপনার মনে আছে? চোর আমাদের চোখের সামনে বসেছিল। সতর্ক থেকেও তাকে ঠেকাতে

পারিনি। এখানে এসে আমার কী মনে হয় জানেন? এই শিল্পোদ্যোগের প্রাণবস্তুও চুরি হয়ে গেছে। চোখের সামনেই চুরি হয়েছে। পড়ে আছে শুধু চকচকে খোলসটা আর তাই নিয়েই আমরা ঢাক পিটোচ্ছি আর সবাইকে ডেকে ডেকে বলছি, দেখ দেখ, কী অপূর্ব বস্তু তৈরি হয়েছে।

সেদিন কোয়ার্টারে ফেরবার পথে সবুজ পাহাড়ে উঠেছিলাম। এখানে দাঁড়ালে আলোর মালা জড়ানো সারা প্রোজেক্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কারখানার শেড ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছে বড়ো বড়ো সার্চপোস্ট। উদ্ভাসী আলো দৈত্যের মতো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে কারখানার ইয়ার্ডের দিকে। আর কারখানার তিনদিকে অর্ধবৃত্তাকারে সারি সারি কোয়ার্টার। মধ্যে মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বড়ো বড়ো পার্ক আর খেলার মাঠ, হাসপাতাল ও স্কুল, লাইব্রেরি ও দোকানপাট। অ্যাস্‌ফল্ট বাঁধানো উঁচু-নিচু রাস্তা চিকচিক করে। পার্কের ধারে থোকা থোকা লাল ফুলগুলোকে মনে হয় যেন এক-এক টুকরো আগুন। পাম্পিং স্টেশনে ঝিক্‌-ঝিক্‌ শব্দে মোটর চলার শব্দ সবুজ পাহাড় থেকে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। এগারো কিলোভোল্টের হাইটেন্‌শন তার হঠাৎ গোঁ-গোঁ আর্তনাদ করে ওঠে।

ইরেকটিং শপের ফোরম্যানের কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। এই সবুজ পাহাড়ে বসে দূরপ্রসারিত কারখানা আর আলোর মালা জড়ানো বসতি অঞ্চলের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাসকরতে ইচ্ছে হয় যে একটি বিরাট পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পেয়েছে এবং এই শিল্পোদ্যোগ যে-কোনো দেশের পক্ষে গর্বের বস্তু। আর এই মুহূর্তে একবারও মনে হয়না যে চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে তা শুধু বাইরের চাকচিক্য এবং এই শিল্পোদ্যোগের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রাণবস্তু খোয়া গেছে।

তৃতীয় নয়ন



'পাষাণী-অহল্যা' কথাটা আমি প্রথম শুনি আমার একজন খালাসীর মুখে। নাম অনন্ত, বছর কুড়ি-একুশ বয়স, অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখেছে। লেখাপড়া মানে স্কুলের লেখাপড়া, কলেজে ঢোকবার সৌভাগ্য আর হয়নি। একমাত্র ছেলের সম্পর্কে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা করে বাপ শেষপর্যন্ত ভদ্রাসন বাঁধা দিয়ে ছেলের পরীক্ষার ফী দিয়েছিলেন। পাশ করার খবরটুকুও জেনে যেতে পারেননি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের খবর জেনে যেতে না পারলেও জীবনের অন্য এক পরীক্ষায় ছেলেকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের। আপাতত বিধবা মা ও অনতিক্ষুদ্র এক সংসারের বোঝা নিয়ে ছেলেটি এই প্রোজেক্টে গত তিন বছর খালাসীর কাজ করছে। বাপের স্বপ্নকামনা ছেলের মনে কতদূর সংক্রামিত হয়েছিল জানি না কিন্তু এখনো ও আশা রাখে, ক্লাস-ফোর খালাসী থেকে ক্লাস-থ্রী কেরানি বা টেলিফোন অপারেটরের পোস্টে ওর পদোন্নতি হবে। এবং পদোন্নতি হবার আগেই ক্লাস-থ্রী কর্মচারীসুলভ চালচলন বেশ আয়ত্ত হয়ে গেছে।

আমি একদিন ওকে রাস্তার ধারের ডি-পি বাক্সে কতকগুলো লাইট্নিং অ্যারেস্টার পাল্টিয়ে দিয়ে আসতে বলেছিলাম। কথাটা শুনে ও একটু ইতস্তত করল। কোথায় ওর বাধছিল আমি তখনো বুঝতে পারিনি। বললাম, কিছু

শক্ত কাজ নয়। দেখবে, দু-পাশে দুটো স্ক্রু আঁটা আছে। স্ক্রু-দুটো খুললেই অ্যারেস্টার খুলে আসবে।

ও বললে, আমার বড়ো ভয় করে স্যার।

আমি বললাম, কেন?

বাক্সের মধ্যে গোঁ গোঁ আওয়াজ হয়! ঠিক অহল্যার কান্নার মতো। পরে জেনেছিলাম, রাস্তার ধারে সিঁড়ি লাগিয়ে পোস্টে উঠতেই ওর যতো আপত্তি। আর তখন প্রায় পাঁচটা বাজে, আরেকটু পরেই কারখানা ছুটির ভোঁ বাজবে, আর হাজার হাজার কর্মচারী ছুটির পরে বাড়ি যেতে যেতে ওকে দেখবে এই অবস্থায়। মেরে ফেললেও তখন ওকে দিয়ে ওই কাজ করানো যেত না।

অথচ আমার মনে আছে, একবার আমার অসুখের সময় ও আমার জন্যে যা করেছিল অনেক পতিপ্রাণা স্ত্রীও স্বামীর জন্যে তা করবে কিনা সন্দেহ। রাস্তার ধারে মই বেয়ে পোস্টে উঠতে যে লজ্জা পায়, সে আরেকজনের অসুখের সময় অম্লান মুখে মেথরের কাজ পর্যন্ত করছে, এ দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আর অহল্যার কান্না কাকে বলে তা সেদিন রাতে প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম। হঠাৎ সারা বাড়ির বদ্ধ হাওয়া চাপা গোঙানি তুলে কেঁপে কেঁপে উঠল। এমন প্রায়ই হয়, কেন হয় তাও আমি জানি। পর পর ছাদের ওপরে ওয়াল-ব্র্যাকেট লাগিয়ে আটশো পাউণ্ডের ইলেকট্রিক তার একটানা টেনে নেওয়া হয়েছে। বাতাসের ধাক্কায় এই তার কাঁপতে শুরু করলেই এই ধরনের চাপা গোঙানি ওঠে। কিন্তু সেদিন রাতে তবুও যেন মনে হল, যুক্তি-তর্কের প্রশ্ন নয়, এই চাপা গোঙানির অন্য একটা অর্থ আছে যেন। অহল্যার কান্না!

আর এই উপলব্ধি আমার একার নয়। বাংলো থেকে 'এ' টাইপ পর্যন্ত সকলের। আমার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হঠাৎ একদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে চোখ লাল করে বললেন, আপনাকে আমি চার্জশীট্ দেব। এটা অফিসারদের কথার মাত্রা, চুপ করে পরের কথার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি বললেন,

আপনি এমন টেলিফোনের তার টেনেছেন যে মড়াকান্নার মতো গোঁ গোঁ আওয়াজ হয়। কাল সারা রাত মেমসাহেব ঘুমোতে পারেননি জানেন?

মেমসাহেব মানে ভদ্রলোকের স্ত্রী। ইতরজনের কাছে স্ত্রীকে এই নামে পরিচয় দেওয়াই এখানকার রীতি।

আমি জানতাম, এই গোঁ গোঁ আওয়াজ কেন হয়। আবার এও জানতাম সেই কারণটুকু এই বিলেতফেরত ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা বৃথা। মুখ চুন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরিয়েই দেখি, দরজার পাশটিতে দাঁড়িয়ে অনন্ত দাঁত বের করে হাসছে। বুঝতে পারলাম, ঘরের ভিতরকার কথাবার্তা ও কান পেতে আগাগোড়া শুনেছে। আমাকে হঠাৎ বেরিয়ে আসতে দেখেই ও ছুটে পালিয়ে গেল। সে-দিন বিকেলে ক্যান্টিনে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ শুনি পাশের টেবিলে বসে অনন্ত কাকে যেন বলছে, জানিস রে, অহল্যার কান্না শুনে কাল রাতে মেমসাহেবের ঘুম হয়নি।

পাষাণী অহল্যার কান্না! এমনিতে কথাটার কোনো অর্থ হয় না। অহল্যা যদি পাষাণীই হবে তবে তার আবার কান্না কিসের? কিন্তু লোকের মুখে যখন কোনো কথা তৈরি হয়ে যায় তখন সে-কথার সঙ্গে ব্যাকরণ বা পুরাকথার সঙ্গতি আছে কিনা তা বিচার করতে বসার কোনো অর্থ হয় না। কথাটা যে মিথ্যে নয় তা এখানে এলে উপলব্ধি করা যায়। যতবার এই চাপা গোঙানি শুনি, আমার শুধু মনে হয়, পাষাণী অহল্যা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্যে কাঁদছে। মেমসাহেবের তো ঘুম না হবারই কথা!

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় লাফাতে লাফাতে হাঁপাতে হাঁপাতে অনন্ত আবার কোয়ার্টারে এসে হাজির।

বললে, এবার স্যার আপনাকে কিন্তু আমি ছাড়ছি না।

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার ?

খুব যেন একটা গোপনীয় কথা বলছে এমন ভঙ্গি করে ও আবার বললে, জানেন স্যার, মিস সেন চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

মিস সেনের চাকরি ছাড়ার সঙ্গে আমাকে না-ছাড়ার কী সম্পর্ক সেটা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। মিস সেন এখানকার একজন টেলিফোন অপারেটর। মিস সেনের চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া মানেই একটি পোস্ট খালি হওয়া। এবং শূন্য পদটিতে অনন্তের জন্যে আমাকে চেষ্টা করতে হবে। আমি বললাম, মিস সেন তো আজো নাইট ডিউটি করছেন, উনি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন বলে তো কোনো চিঠি দেননি।

অনন্ত বললে, আজ নাইট ডিউটি করে কাল ভোরের ট্রেনে উনি কলকাতা চলে যাচ্ছেন। সেখান থেকে প্রথমে তিন মাসের সিক্-রিপোর্ট করবেন। তারপর চাকরি ছেড়ে দেবেন।

বুঝলাম, সমস্ত খবর পাকাপাকি নিয়েই অনন্ত এসেছে। বললাম, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে মস্ত একটা টাইপ করা দরখাস্ত। বললে, খুব জোর লিখবেন স্যার, আপনি লিখলে নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আর আপনি তো জানেন স্যার, কাজ আমি শিখেছি।

কথাটা ঠিক। অবসর সময়ে শিক্ষানবিশী করে টেলিফোন অপারেটরের কাজটা ও খুব ভালোভাবেই শিখে নিয়েছে। ও যদি টেলিফোন অপারেটর হয় তবে যোগ্য পাত্রই নির্বাচিত হবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

অনন্তর জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। পরদিন সকালে খবর নিয়ে জানলাম, মিস সেন সত্যি সত্যি কলকাতায় গেছেন। কোয়ার্টার খালি করে মালপত্র পর্যন্ত নিয়ে গেছেন সঙ্গে। অনন্তর খবর মিথ্যে নয়।

অনন্তর দরখাস্তটা নিয়ে নিজেই গেলাম এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। দেখলাম, ভদ্রলোকের মেজাজ সেদিন খুব ভালো। সুযোগ বুঝে পেড়ে বসলাম

কথাটা। শুনে ভদ্রলোক একেবারে হা হা করে হেসে উঠে বললেন, মিস সেন যে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন তা তো আমি অনেক আগেই জানি।

আমি বললাম, কিন্তু মিস সেনের জায়গায় অন্য একজন অপারেটর না পেলে ভারি অসুবিধে হবে।

তেমনি হেসে ভদ্রলোক বললেন, তা কি আমি জানি না? যেদিন মিস সেন সিক্-রিপোর্ট করে বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে চিঠি দেবেন সেদিন থেকেই নতুন অপারেটর জয়েন্ করবে।

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হল। চারদিনের দিন মিস সেনের সিক্-রিপোর্ট পেলাম, পাঁচ দিনের দিন নতুন একজন মেয়ে অপারেটর কাজে যোগ দিল। বেণী-সংবদ্ধকুন্তলা কালো মেয়েটি। শম্পা।

শম্পার কাজে যোগ দিতে আসাটাও রীতিমতো একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে।

মনে আছে সেটা ছিল নভেম্বর মাস। শীতকালের রোদ-ঝকঝকে দিন। এ সময়ে দুপুরের রোদও মিষ্টি লাগে। বাইরের কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। শীতকালের মধ্যেই টেলিফোনের খাম্বা তোলা আর তার টানার কাজ যথাসম্ভব শেষ করে ফেলার ইচ্ছে ছিল আমার। এর পরে যখন গ্রীষ্ম শুরু হবে আর সারা প্রোজেক্ট এক টুকরো কাঁচের মতো জ্বলতে থাকবে তখন কোনো মানুষই একটানা বেশিক্ষণ বাইরের কাজ করতে পারে না। বর্ষাকালে তো এমন পচা বৃষ্টি যে অধিকাংশ দিন বাইরের কাজ একেবারে মুলতুবী রাখতে হয়। ওদিকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিরণ্ময় বসু প্রচণ্ড তাড়া লাগিয়েছেন। ভদ্রলোক বোধ হয় চান যে এই সাত বর্গমাইল প্রোজেক্টের দু-শোটা টেলিফোন রাতারাতি লাগিয়ে ফেলা হোক। সুতরাং এ-সময়ে একটি দিনও নষ্ট হয় এটা আমার অভিপ্রেত ছিল না। ভোরবেলা কন্‌স্ট্রাকশন পার্টি নিয়ে বেরোতাম আর ফিরে আসতাম বিকেল পাঁচটার পরে।

এমনি এক কাজের দিনে বাবুপাড়ার রাস্তায় বোসসাহেবের ল্যাণ্ডরোভার এসে

হাজির। খালাসীরা ল্যাণ্ডরোভার দেখেই দূর থেকে সেলাম ঠুকেছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল ল্যাণ্ডরোভারে বোসসাহেব নেই, আছে বোসসাহেবের চাপরাশি। আমার কাছে এসে বোসসাহেবের চাপরাশি বললে, আপনাকে সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন।

আচ্ছা যাচ্ছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার নড়বার উপায় ছিল না। টেলিফোনের তার টেনে সবেমাত্র এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে ; এই সময়ে কেব্‌ল্‌-পেয়ারের নম্বর ইত্যাদি বলার জন্যে একজন অভিজ্ঞ লোক থাকা প্রয়োজন। আর এই প্রোজেক্টে টেলিফোনের কাজে একমাত্র অভিজ্ঞ লোক হচ্ছি আমি। অতএব এ-সময়ে আমার এখানে না-থাকার অর্থ হচ্ছে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া। হাতের কাজ শেষ না করে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না।

কিন্তু বোসসাহেবের চাপরাশি বললে, সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছেন, আপনাকে এই গাড়ি করে এক্ষুনি যেতে হবে।

একথার উত্তরে আর দ্বিতীয় কোনো কথা বলবার উপায় নেই। কিছুক্ষণের জন্যে কাজ স্থগিত রেখে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম বোসসাহেবের ল্যাণ্ডরোভারে। ভেবেছিলাম, ভয়ানক জরুরী কিছু একটা প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। নিজের গাড়ি পাঠিয়ে বোসসাহেব এর আগে আর কোনোদিন আমাকে এভাবে ডেকে পাঠাননি। অফিসাররা সাধারণত অধস্তন কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্যে নিজেদের ল্যাণ্ডরোভার কক্ষনো ছেড়ে দেয় না।

এই প্রোজেক্টে ল্যাণ্ডরোভারের যা সম্মান মানুষের তা নেই।

অফিসারদের ল্যাণ্ডরোভার রাস্তা দিয়ে যখন যাতায়াত করে তখন রাস্তার মানুষকে দাঁড়িয়ে পড়ে সেলাম ঠুকতে হয়। অফিসারের ল্যাণ্ডরোভারে চাপবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার ষোলো মাসের চাকরি-জীবনে দু-বার মাত্র এসেছিল। বোসসাহেবের জরুরী তলব পেয়ে এই একবার আর চাকরি জীবনের শেষদিনে আর একবার। সে-কথা যথাসময়ে বলব।

বোসসাহেবের ঘরে ঢুকে দেখলাম, সামনের চেয়ারে দরজার দিকে পিছন করে একটি মেয়ে বসে। প্রথমেই নজরে পড়ে, পিঠের ওপর দিয়ে নেমে গেছে মস্ত লম্বা একটি বেণী।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বোসসাহেব বললেন, ইনি হচ্ছেন আপনার নতুন টেলিফোন অপারেটর। মিস শম্পা মিত্র। একে একটু কাজকর্ম শিখিয়ে নিতে হবে।

বেণীসংবদ্ধকুন্তলা সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। রোগা কালো চেহারা, ছোট এতটুকু মুখ, আর সারা মুখের মধ্যে জলজল করছে বড়ো বড়ো দুটো চোখ। বিশেষ করে তাকিয়ে দেখবার মতো কিছু ছিল না মেয়েটির চেহারায়।

আমি বললাম, আচ্ছা।

বোসসাহেব বললেন, আজ বিকেলের মধ্যে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। কাল সকালে ওকে সিলেক্‌শন বোর্ডের সামনে হাজির হতে হবে।

আমি আবার বললাম, আচ্ছা।

সিলেক্‌শন বোর্ডের খবরটা আমার কাছে নতুন। বুঝলাম যে শম্পা মিত্রকে পাকাপাকি চাকরিতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এর আগে কোথায় কাজ করেছেন?

মুখ নিচু করে আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াতে জড়াতে সে জবাব দিল, কোথাও কাজ করিনি।

কোনোদিন টেলিফোন অপারেটরের কাজ করেননি?

না।

টেলিফোনের সুইচবোর্ড কোনোদিন দেখেছেন?

না।

এবার আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। মুখের দিকে তাকালে সবচেয়ে প্রথমে নজর পড়ে বড়ো বড়ো দুটি চোখের দিকে। চোখদুটির মধ্যে মনের সমস্ত

চিন্তা মুহূর্তে মুহূর্তে ছাপ ফেলে যাচ্ছে যেন। এমন অদ্ভুত বাঙ্ময় চোখ আমি আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আপনি জানেন যে আপনাকে আগামী কাল সিলেকশন বোর্ডের সামনে হাজির হতে হবে?

জানি।

টেলিফোন অপারেটরের চাকরি করতে এসেছেন, সুতরাং সিলেকশন বোর্ড আপনাকে টেলিফোন সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করবে—কী জবাব দেবেন আপনি?

সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে রইল।

সেদিনকার মতো আমার বাইরের কাজ পণ্ড হয়েছিল। আমি ভাবতেও পারিনি যে এই সামান্য প্রয়োজনে বোসসাহেব আমাকে এভাবে ডেকে পাঠাবেন। ভারী অবাক লাগল।

কিন্তু অবাক হওয়ার আরো কিছু বাকি ছিল।

পরদিন ভোর সাতটার সময় টেলিফোনে আমাকে ডেকে বোসসাহেব বললেন, আপনি ঠিক দশটার সময় আপিসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। বাইরের কাজ সেদিনও মুলতুবী রেখে দশটার সময় ছুটলাম আপিসে।

টেবিলের ওপর পেনসিলের টোকা দিতে দিতে নেহাতই কথার পিঠে কথা বলে যাওয়ার মতো করে বোসসাহেব বললেন, সিলেকশন বোর্ড থেকে কী ধরনের প্রশ্ন করা উচিত—জবাব সমেত তার একটা খসড়া আপনি করে দেবেন।

আমি বললাম, আচ্ছা।

দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে বোসসাহেব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, কাল আপনি কটা টেলিফোন লাগিয়েছেন?

আমি বললাম, কাল নতুন টেলিফোন লাগানো হয়নি।

কেন?

চুপ করে রইলাম।

বোসসাহেব পকেট থেকে ডায়েরি বার করলেন। একটা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় এসে

পৃষ্ঠাজোড়া ক্ষুদে ক্ষুদে লেখার মধ্য থেকে কি যেন খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলেন খানিকক্ষণ ধরে। মনে হল, যে জিনিসটা খুঁজে পেতে চাইছেন তা তিনি পাচ্ছেন না।

পরে ডায়েরিটা বন্ধ করে আমাকে বললেন, আপনাকে আগেও বলেছি, আজও আবার বলছি—কাজের এমন একটা প্রোগ্রাম করে নিন যেন রোজ অন্তত তিনটি করে নতুন টেলিফোন লাগানো যেতে পারে। কথাটা মনে রাখবেন।

শান্ত গলার স্বর। বুঝলাম, আজ আর আমার ওপরে চোটপাট হবে না। এখন যদি আমি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করি টেলিফোনের কাজের ধরনটাই এমন যে রোজ নির্দিষ্ট সংখ্যক নতুন টেলিফোন লাগানো যেতে পারে না তাহলেও উনি মন দিয়ে শুনবেন। কিন্তু ঐ শোনাটুকু পর্যন্তই। পরদিন আবার সেই একই প্রশ্ন। ডায়েরির পৃষ্ঠায় কি যেন খুঁজে দেখা। তারপরে কোনো কোনো দিন চার্জশীটের ভয়, কোনো কোনো দিন শান্ত স্বরে উপদেশ। ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। পিছন থেকে ডেকে বোসসাহেব বললেন, আর শুনুন, মিস মিত্র যেন সিলেক্শন বোর্ডের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারে এমনভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে দেবেন।

আমাকে বলতে হল, আচ্ছা।

ঘটনাটা এখনও আমার মনে আছে। দশটা প্রশ্ন তৈরি করলাম আমি; আলাদা একটা কাগজে জবাব লিখে দিলাম প্রশ্নগুলোর। প্রশ্নগুলোর জবাব পাখিপড়ার মতো মুখস্ত করে নিলেন শম্পা মিত্র এবং বলা বাহুল্য নির্বাচনী বোর্ডের বিচারে উত্তীর্ণদের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে বসলেন। অন্যান্যদের মধ্যে থেকে তিনজনের একটা প্যানেল তৈরি করে রাখা হল।

এই নির্বাচনী বোর্ডের সামনে হাজির হবার জন্যে আরো অনেক চাকরি-প্রার্থী হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে টেলিফোন অপারেটরও ছিল। তা সত্ত্বেও সকলকে ডিঙিয়ে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিতা হলেন শম্পা মিত্র। মিস সেনের শূন্যস্থানে

সেদিনই অস্থায়ী নিয়োগপত্র পেলেন তিনি এবং নির্বাচনী বোর্ডের রায়ের ভিত্তিতে দিন সাতেকের মধ্যেই তাঁর চাকরি পাকা হয়ে গেল।

শম্পাকে আমি পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কবে চাকরির দরখাস্ত দিয়েছিলেন?

শম্পা ঠিক করে কিছু বলতে পারল না। তবে 'জামাইবাবুকে' নাকি অনেক দিন থেকেই মুখে বলা ছিল। হঠাৎ দিন সাতেক আগে জামাইবাবুর টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির। শম্পার চাকরি ঠিক হয়ে গেছে, শম্পাকে এক্ষুনি রওনা হতে হবে।

বুঝলাম, যে-খবর অনন্ত মাত্র আগের দিন-সন্ধ্যায় পেয়েছিল, সে-খবর শম্পার 'জামাইবাবু' সাতদিন আগেই সন্দেহাতীতভাবে জেনে নিয়েছেন। সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খালাসীর ডিউটি করার পরেও অবসর সময়ে একটু একটু করে শিখে অনন্ত যে-চাকরির জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছে, বি এস-সি ক্লাশের ছাত্রী শম্পা এর আগে কোনোদিন সুইচ্‌বোর্ড না দেখেও সকলকে ডিঙিয়ে সেই চাকরিতে পাকা হয়ে বসে গেল! এখানে অনেকে বলে, অফিসারদের নাকি তৃতীয় নয়ন আছে। কথাটা ঠিক। তবে এই তৃতীয় নয়ন কপালে নয়, মাথার পেছন দিকে। যে-ঘটনা কেউ দেখে না তা তৃতীয় নয়ন প্রত্যক্ষ করে। আবার যে-ঘটনা চোখের সামনে ঘটছে তা এই তৃতীয় নয়নের দৃষ্টির অগোচর।

অফিসার মাত্রই 'সাহেব'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম ভক্তদের মুখে অনেক সময় শ্রীহীন হয়ে পড়ে, তাতে তিনি রাগ করেন না। কিন্তু এক্‌সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিরণ্ময় বসুকে 'বোসসাহেব' না বললে তিনি শুধু রাগই করেন না, সেই রাগ নানা উপায়ে প্রকাশও করে থাকেন। শুধু বোবসাহেব নন, অন্য সাহেবরাও।

একটি ঘটনা আমার মনে আছে। চাকরিতে যোগ দেবার প্রথম দিনেই এক্-সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, দেখুন, রায়সাহেবের টেলিফোন দু-দিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। আপনি নিজে গিয়ে টেলি-ফোনটা সারিয়ে আসুন।

'রায়সাহেব' শুনে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, ব্রিটিশ আমলের খেতাবের প্রতি এখন আর কারও বিশেষ মোহ নেই। তাহলে এখনো এমন লোক আছেন যিনি ব্রিটিশ আমলের খেতাবে উল্লিখিত হতে পছন্দ করেন! পরে জেনেছিলাম, আসল ব্যাপার তা নয়। এখানে অফিসাররাও ইতরজনের কাছে অপর কোনো অফিসারের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে হলে সেই অফিসারের পদবীর সঙ্গে 'সাহেব' যোগ করে কথা বলেন। এইটেই রীতি। আর ইতর-জন যদি অফিসারের পদবীর সঙ্গে 'সাহেব' যোগ না করে তবে সেইটে প্রায় অপরাধ।

রায়সাহেবের টেলিফোনে রিসিভারের তার কেটে গিয়েছিল, সুতরাং কথা শোনা যাচ্ছিল না। টেলিফোনটা সারিয়ে ফিরে এসে টেস্ট করবার জন্যে এক্সচেঞ্জ থেকে ঘন্টি দিলাম। রায়সাহেব নিজে এসে টেলিফোন ধরলেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, মিঃ রায়?

সে কথার জবাব না দিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনি কে?

আমি নিজের পরিচয় দিলাম।

শুনে তিনি বললেন, আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না।

শুনতে পাচ্ছেন না?

না! রাগত স্বরে এই একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে তিনি সশব্দে টেলিফোন রেখে দিলেন।

টেলিফোনের একজন মেকানিক পাশে দাঁড়িয়েছিল। তিন বছর সে এই প্রোজেক্টে কাজ করেছে। সে আমাকে বললে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, আমি টেলিফোন সারিয়ে দিচ্ছি।

মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে সে আবার ঘণ্টি দিলে।

আপনি স্যার, রায়সাহেবের কথা বলছেন স্যার?

ওপাশ থেকে জবাব এল, হ্যাঁ।

আপনি স্যার, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন স্যার?

পাচ্ছি।

প্রথম দিনের এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও একই ভুল আরও কয়েকবার করেছি। তার শাস্তিও আমাকে কম পেতে হয়নি। কিন্তু সে-সব কথা থাক।

টেলিফোন সারানোর ব্যাপারে আরেক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন খোদ বোসসাহেবের টেলিফোনই খারাপ ছিল। সন্ধে পর্যন্ত চেষ্টা করেও সারানো যায়নি। ভেবেছিলাম, পরের দিন দিনের আলোয় ভালোভাবে দেখা যাবে। একটা রাত্রি টেলিফোন খারাপ থাকলে কি আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়?

রাত প্রায় দশটার সময় বোসসাহেবের চাপরাশি এসে হাজির। বোসসাহেব নোট পাঠিয়েছেন, আজ রাতের মধ্যেই যে-করে হোক তাঁর টেলিফোন সারাতে হবে। কাল ভোরবেলা টেলিফোনে অত্যন্ত জরুরী সব খবর পাঠাতে হবে তাঁকে।

সেই রাতের কথা সহজে ভুলব না। ওপরে তারা ঝলমলে আকাশ, নিচে আলো ঝলমলে শহর। কিন্তু মাঝখানে যেন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। টেলিফোনের তার কোথাও তিরিশ ফুটের বেশি উঁচু নয়। আর আমরা ছিলাম তিনজন—লাইনম্যান, মেকানিক ও আমি। কিন্তু সেই তিন জোড়া চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন। একশো পাউণ্ডের জি-আই তার, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন অনেক দূরে আকাশের গায়ে কয়েকটা কালো দাগের হিজিবিজি।

প্রায় দু-ঘণ্টা চেষ্টার পরে কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে বোসসাহেবের টেলিফোনকে কাজ করবার মতো অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল।

কী এমন জরুরী খবর, জানবার জন্যে আমার ভয়ানক কৌতূহল হয়েছিল। আমার এই কৌতূহল অন্যায়, ততোধিক অন্যায় একটা উপায়ে আমি এই কৌতূহল চরিতার্থ করেছিলাম। কিন্তু সেজন্যে আমার মনে কিছুমাত্র অনুশোচনা হয়নি।

পরদিন ভোরবেলা এক্সচেঞ্জে গিয়ে এম-ডি-এফ-এ হেডগিয়ার লাগিয়ে বোস-সাহেবের লাইন ট্যাপ করেছিলাম। যে-সব জরুরী খবর তিনি পাঠিয়েছিলেন তার কিছু কিছু এখনো আমার মনে আছে।

প্রথম কল্ মল্লিক নামে একজন সিনিয়র সাবর্ডিনেটকে।

কে, মল্লিক নাকি?

আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার।

আজ পাঁচ সের বাড়তি হয়েছে, তোমার কতটা চাই?

আজ্ঞে……

যাই হোক, সবটাই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার নিজের যতোটা দরকার হয় নিও, বাকিটার ব্যবস্থা কোরো।

দ্বিতীয় কল্ ঘোষ নামে একজন সুপারভাইজারকে।

ঘোষ, আজ আমার বাড়িতে দশজনকে পাঠিও।

আচ্ছা স্যার।

তৃতীয় কল্ বুঝতে আমার নিজেরই একটু সময় লেগেছিল। এবারে তিনি কথা বলছেন গণেশ নামে একজন ক্লাস-ফোর খালাসীর সঙ্গে।

বোসসাহেব বললেন, গণেশ, আজ হাট-বার মনে আছে তো?

আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার।

পেঁপেগুলো আজ সব নিয়ে যেও, কেমন?

আচ্ছা স্যার।

আমি সেদিন সত্যিই হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। এসব কোন্ ধরনের কোডে কথা-বার্তা? পরে টেলিফোন অপারেটরদের কাছে জেনেছিলাম, এই বিশেষ ধরনের জরুরী কথাবার্তা শুধু বোসসাহেব কেন, প্রোজেক্টের সব সাহেবই বলে থাকেন। বাড়িতে যদি পাঁচ সের দুধ বেশি হয়, জন দশেক লোককে কাজ করাতে হয় বাগানে, গাছের পেঁপে হাটে পাঠাতে হয় বিক্রির জন্যে—সে-কথা ভোরবেলাতেই হয়ে থাকা দরকার বৈকি। আর এই সামান্য খবর পাঠাতে যদি চারদিকে

লোক ছোটাতে হয় তাহলে আর সরকারী খরচে বাড়িতে টেলিফোন থাকার সার্থকতা কি।

অফিসারদের বাড়ির টেলিফোন সারাতে গিয়ে আমার আরো অনেক অভিজ্ঞতাই হয়েছে। আরেকটি ঘটনা বলছি। একবার লাঞ্চ থেকে ফিরে এসে বোস-সাহেব আমাকে খবর পাঠালেন যে তাঁর বাড়ির টেলিফোন খারাপ হয়ে গেছে, আমি যেন এক্ষুনি গিয়ে সারিয়ে আসি। খবর পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বোসসাহেবের বাড়ির দিকে।

তখন ভরা দুপুর। আর এই বিহারসংলগ্ন দেশের দুপুর সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে তাঁদের বলে বোঝাতে হবে না সেই ভরা দুপুরে মাইল পাঁচেক পথ পাড়ি দেওয়া কী কষ্টকর। ভূগোল বইয়ে যে দশ দিকের কথা বলা হয়েছে—তা এই সময়ে যেন খুব ভালো করে বোঝা যায়। ওপরে আগুনঝরা আকাশ; তলায় পিচগলা রাস্তা; সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে এবং কোণাকুণি—দশ দিক থেকে যেন আগুনের হল্‌কা সূচের মতো গায়ে বিঁধছে। চোখ জ্বালা করে বললে কিছুই বলা হয় না, চোখকে অন্ধ করে দেয়।

এই অবস্থায় বোসসাহেবের বাড়ি পৌঁছে চাপরাশি মারফত শুনলাম, বোস-সাহেবের মেমসাহেব ড্রয়িংরুমে বসে রেডিও শুনছেন, সুতরাং এখন ওঘরে গিয়ে টেলিফোন সারানো চলবে না।

উপায় নেই। ফিরে আসতে হল। ভাবলাম, আবার তো আসতেই হবে। কাজ কি ফিরে গিয়ে, আবার এই পাঁচ মাইল পথ দু-দুবার পাড়ি দেওয়া? এখানেই কোথাও অপেক্ষা করা যাক। দুপুরের রেডিও প্রোগ্রাম তো তিনটে পর্যন্ত, তারপরে আবার আসা যাবে।

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল, কোথাও একটু ছায়া থাকলে যেন বড়ো ভালো হত। সারা প্রোজেক্‌ট যেন এক টুকরো কাঁচের মতো জ্বলছে। গাছ নেই, ছায়া নেই। এই শিল্প-নগরীর পত্তনের সময় সমগ্র এলাকাকে প্রায় নিষ্পাদপ করে ফেলা হয়েছিল। মহুয়া নেই, পলাশ নেই, শুধু কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ; একটি

সাহেবপাড়ায়, দুটি হাসপাতালের সামনে আর আরো দু-একটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সাহেবপাড়ার তিনটি সমান্তরাল রাস্তা এক নম্বর ব্যারিয়ার গেটের সামনে মিলেছে। একসঙ্গে নয়, প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয়টি সঙ্গে তৃতীয়টি। এই সঙ্গমস্থলকে এ-পাড়ার বাসিন্দারা বলে 'প্যারাবোলা,' প্রোজেক্টের ব্লু-প্রিণ্টেও তাই লেখা আছে। আর এই প্যারাবোলার সামনেই একটা গোল উঁচু ঢিবি, তার নাম 'ওভ্যাল'। অবশ্য প্যারাবোলার মতো 'ওভ্যাল' সাহেব-পাড়ার একচেটিয়া নয়, অন্যত্রও আছে। এই ওভ্যাল আর প্যারাবোলার সামনেই সাহেবপাড়ার সেই বিরাট অশ্বত্থ গাছ। ডালপালায় বিস্তীর্ণ প্রাচীন গাছ, প্রকাণ্ড একটা গোল জায়গায় নিবিড় ছায়া ফেলেছে। প্রোজেক্টের ব্লু-প্রিণ্টে এই অশ্বত্থ গাছটির অবস্থান নির্দিষ্ট হয়নি, হলে কি নামে চিহ্নিত হত তা গবেষণাসাপেক্ষ— অশ্বত্থ গাছের ইংরেজি প্রতিশব্দ প্যারাবোলা বা ওভ্যালের কাছে নেহাতই অচল বলে মনে হয়।

অশ্বত্থ গাছের তলায় গোল বাঁধানো চত্বর। হাঁটতে হাঁটতে শেষপর্যন্ত সেই স্নিগ্ধ আশ্রয়ে পৌঁছে গেলাম। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, জীবনের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে খুব বড়ো উপকরণের প্রয়োজন হয় না। এই আগুনঝরা মধ্যাহ্নে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরা না হলেও আমাদের হয়তো চলে কিন্তু এমনি একটু ছায়াসুনিবিড় আশ্রয় যেন থাকে।

সেদিন খাস সাহেবপাড়ার অশ্বত্থ গাছের চত্বরে বসে আরেকটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়েছিল। কয়েকটা সিঁদুরমাখানো নুড়ি। এ-পাড়ার বেয়ারা-বাবুর্চিরা সাহেবদের চেয়েও বড়ো সাহেব, সিঁদুরমাখানো নুড়ি ফেলল কে?

প্রায় চারটের সময় আবার গেলাম বোসসাহেবের বাড়িতে। এবার শুনলাম, মেমসাহেবের কাছে আরেকজন মেমসাহেব বেড়াতে এসেছেন এবং দুজনে চা খাচ্ছেন ড্রয়িংরুমে বসে। আরো পরে আসতে হবে। এবারে বোধ হয় আমাকে দেখে বোসসাহেবের চাপরাশির দয়া হয়েছিল। বারান্দার এক কোণে একটা

চেয়ার টেনে দিয়ে সে আমাকে বললে, আপনি একটু বসুন, ঘর খালি হলেই আমি খবর দেব।

আশেপাশে চায়ের দোকান থাকলে আমিও একটু চা খেয়ে নিতাম। কিন্তু এ পাড়ায় চায়ের দোকান নেই। আকণ্ঠ চায়ের পিপাসা নিয়ে সাড়ে চারটে পর্যন্ত মেমসাহেবদের চা-পর্ব শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে হল।

প্রায় পাঁচটার সময় বোসসাহেবের টেলিফোন সারিয়ে ফিরে আসছি, এমন সময় রাস্তায় স্বয়ং বোসসাহেবের সঙ্গেই দেখা। ল্যাণ্ডরোভারে চেপে তিনি বোধ হয় বাড়ি ফিরছিলেন অনেক দূর থেকে আমাকে দেখে ইলেকট্রিক হর্ন বাজিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়েছেন।

সামনে যেতেই বললেন, আজ সন্ধ্যার সময় আমার বাড়িতে একবার আসতে পারবেন?

বাধ্য হয়ে বলতে হল, পারি।

তাহলে আসবেন, বিশেষ দরকার আছে।

পৃথিবী রসাতলে গেলেও যেতে হত। আর সেদিন বিকেলে একটু ঝড়বৃষ্টি পর্যন্ত হয়নি। সন্ধ্যা না হতেই হাজির হলাম বোসসাহেবের বাড়িতে।

সেই যে চাপরাশিটি আমাকে চেয়ার পেতে বসতে দিয়েছিল, সে-ই এবার আমাকে পথ দেখিয়ে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেল। দেখলাম, সস্ত্রীক বোসসাহেব বসে আছেন। রেডিওতে একটা হিন্দী সিনেমার গান হচ্ছে আর মেমসাহেব সেই গানের তালে তালে চোখ বুজে পা নাচাচ্ছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি চোখ খুলে একটু হেসে বললেন, বসুন।

বসলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্ভুত একটা অনুনাসিক সুরে চিৎকার করে উঠলেন, বে-এ-এ-এ-রা-আ-আ!

ছুটতে ছুটতে একজন বাবুর্চি এসে হাজির।

চালাও!

পরে বুঝেছিলাম তিনি বলেছেন, চা লাও! কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রের ওপরে তিন পেয়ালা চা এল।

হঠাৎ আমাকে কেন এতটা আপ্যায়ন তা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। মেমসাহেবের লাইফ ইন্‌সুয়্যরেন্‌স্ কোম্পানির এজেন্সি আছে, বছরে পাঁচহাজার টাকার কেস্ নাকি দিতেই হবে। এ বছর এখনো পর্যন্ত একটিও কেস্ হয়নি, সুতরাং আমাকেই পাঁচহাজার টাকার লাইফ ইন্‌সুয়্যরেন্‌স্ করতে হবে।

দ্বিতীয় পেয়ালা চা খেয়ে আমাকে সেই দিনই ফর্ম সই করে আসতে হয়েছিল। তারপরেও প্রায় এক বছর আমি প্রোজেক্‌টে চাকরি করেছি। এই একবছরে আমাকে প্রায় দুশো টাকা প্রিমিআম দিতে হয়েছে। প্রথম দিন থেকেই আমি জানতাম যে এত মোটা টাকার প্রিমিআম শেষপর্যন্ত টেনে চলা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। তবে এইটুকুও জানতাম, যতোদিন এই প্রোজেক্‌টে চাকরি করব ততোদিন প্রিমিআম গুণে যেতে হবে। আমার তো তবু এটুকু সান্ত্বনা আছে যে মাসে মাসে আমাকে চড়া দামে বোসসাহেবের দুধ কিনতে হয়নি। বছরে দুশো টাকা মানে মাসে কুড়ি টাকাও নেয়। দিনে পাঁচ সের দুধ কিনতে হলে তো আমাকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসতে হত।

এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আরো দু-বার এমনি মুখোমুখি সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল।

একবার আমার একজন খালাসী টেলিফোন পোস্টে উঠতে গিয়ে অনেকটা উঁচু থেকে পা হড়কে পড়ে যায়। টেলিফোন পোস্ট মানে মরচেধরা বাতিল রেল-লাইন। এই প্রোজেক্‌টে এই জিনিসটির অপ্রচুরতা নেই, রাস্তার ধারে রেলিং দেওয়া থেকে শুরু করে সর্ব কাজে এই জিনিসটির ব্যবহার। এমনকি ডি-ভি-সির এগারো কিলোভোল্‌ট হাইটেন্‌শন সাপ্লাই এই রেলপোস্ট খাড়া করেই আনা হয়েছে।

রেলপোস্টে ঘসা লেগে খালাসীটির সর্বাঙ্গ ছড়ে যায় আর অত উঁচু থেকে পড়বার

জন্যে ভয়ানক চোট লাগে। কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল। চোখেমুখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরে আসার পর ওকে নিয়ে হাসপাতালে যাই।

কিন্তু যখন দেখলাম যে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু সমস্ত শোনার পরেও সামান্য একটু টিংচার-আয়োডিন লাগিয়ে দিয়েই কর্তব্য শেষ করলেন, তখন বললাম, ওকে একটা এ-টি-এস ইনজেকশন দিন।

এ-টি এস মানে অ্যান্টি-টিটেনাস-সিরাম; এই সংক্ষেপোক্তি ডাক্তারদের কাছেই শেখা।

ডাক্তারবাবু বললেন, আমি ডাক্তার না আপনি ডাক্তার?

বললাম, আমি ডাক্তার নই, কিন্তু কলকাতার ডাক্তারদের এসব ক্ষেত্রে এ-টি-এস দিতে দেখেছি।

শুনে আমার দিকে একবার আরক্ত চোখে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, হাসপাতালে এ-টি-এস দিতে হলে ডি-এম-ওর পারমিশন চাই। নিয়ে আসুন ডি-এম-ওর পারমিশন, এক্ষুনি ইন্‌জেকশন দিয়ে দিচ্ছি।

ডি-এম-ও মানে ডিস্‌ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার। বিভাগীয় বড়োকর্তা। ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন যেন বাঘের দুধ আনার মতো একটা অসম্ভব কাজ করতে বলছেন।

আমি জানতাম, এ-টি-এস্ দিতে হলে ডি-এম-ওর অনুমতি লাগে না। আসল কথা, একজন ক্লাস-ফোর খালাসীর জন্যে হাসপাতালের ডাক্তার এত বেশি মাথা ঘামাতে রাজী নন। আমারও কেমন রোখ চেপে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম ডি-এম-ওর ঘরে। স্লিপ পাঠিয়ে মিনিট দশেক অপেক্ষা করে অবশেষে যখন ডি-এম-ওর খাস কামরায় ঢুকতে পেরেছি ঠিক সেই মুহূর্তে ডি-এম-ওর চাপরাশি ঘোষণা করলে, বোস সাব্‌কা মেমসাব্ আয়া।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোসসাহেবের মেমসাহেবের আবির্ভাব। ডি-এম-ও একেবারে শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

একি, আপনি কষ্ট করে এলেন কেন? খবর পাঠালেই আমি যেতাম।

মেমসাহেব বললেন, তাতে কি হয়েছে।

মেমসাহেবের সঙ্গে বছর ষোলো বয়সের অতিলালনপুষ্ট একটি ছেলে। তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, এই আমার বড়ো খোকা। তারপর নিজের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। বড়ো খোকার নাকি ভয়ানক অসুখ। কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। হোস্টেল থেকে কলেজে যেতে হলে ট্রাম ছাড়া গতি নেই। আর কলেজে যাবার সময় দৌড়ে ট্রামে উঠতে গেলেই বড়ো খোকার নাকি বুক ধড়ফড় করে। কলেজ ছুটি হতেই তাই তিনি বড়ো খোকাকে চিকিৎসার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছেন।

আগাগোড়া সমস্তটা শুনে ডি-এম-ও শুধু বললেন, হুঁ।

আতঙ্কবিহ্বল গলায় মেমসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ভয়ের কিছু দেখছেন নাকি?

ডি-এম-ও বললেন, তা নয়. আচ্ছা কলকাতায় ডাক্তার দেখানো হয়নি?

হ্যাঁ, হয়েছিল।

তিনি কি বললেন?

তিনি বললেন, দৌড়ে ট্রামে উঠলে যদি বুক ধড়ফড় করে তবে আর দৌড়ে উঠো না, সেই ট্রামটা ছেড়ে দিয়ে পরের ট্রাম ধোরো।

ডি-এম-ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার ছেলের প্রথমেই একটা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ করা দরকার। তারপরে চিকিৎসা শুরু হবে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

দু-পা এগিয়ে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে পরে দেখা করবেন।

মরিয়া হয়ে বললাম, আমি এক মিনিটও সময় নেব না, দয়া করে আমার কথাটা শুনে যান। তারপরে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য বললাম।

ডি-এম-ও চোখ কোঁচ করে তাকিয়ে বললেন, এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েও আপনারা আমাকে বিরক্ত করবেন? হরিব্‌ল্‌। অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের কাছে গিয়ে বলুন।

এতক্ষণ সময়ের মধ্যে বোসসাহেবের মেমসাহেব একবারও আমার দিকে তাকান নি বা এমন কোনো আভাস দেননি যে তিনি আমাকে চেনেন।

দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল কলকাতায়। আমি গিয়েছিলাম শম্পার কয়েকটা পড়ার বই আনতে। শম্পার বাবার সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোক কলকাতার কোনো এক কলেজে অধ্যাপনা করেন, পড়াশুনো নিয়েই থাকেন দিনরাত। অত্যন্ত শান্ত ও নির্বিরোধী মানুষ। কিন্তু নির্বিরোধী মানুষের সঙ্গেও বিরোধ করবার লোকের অভাব হয় না। স্বয়ং বাড়িওলা পিছনে লেগেছেন। বাড়িওলার ইচ্ছে এই বিশ বছরের ভাড়াটে এবার এই বাড়ির মায়া কাটিয়ে অন্যত্র উঠে যাক। মোটা ভাড়া ও মোটা সেলামীর জন্যেও হতে পারে কিংবা হয়তো নিজেরই ভোগ-দখল করবার ইচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে বাড়িওলার সপক্ষে মামলার রায় বেরুতে পাবে। পরিবার-পরিজনকে নিয়ে কোথায় যাবেন, কোথায় উঠবেন, এই ভেবে যখন দিশেহারা অবস্থা তখন বড়ো জামাইয়ের মুরুব্বিতে ছোট মেয়ে শম্পার এই চাকরি। যাক, একটা 'বি'-টাইপ কোয়ার্টার তো পাওয়া যাবে। নিজে মেসে-বোর্ডিং-এ উঠে আর সকলকে তো পাঠিয়ে দিতে পারবেন। তারপর দেখেশুনে বাড়িভাড়া করে আবার নিয়ে আসা যাবে সকলকে। শম্পার চাকরি ছেড়ে দিতেই বা কতক্ষণ। এসব গল্পই আমার কাছে করছিলেন। সকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল, বৃষ্টিটা যেন আরো চেপে এল।

ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, বসো, তোমার সঙ্গে রুমির আলাপ করিয়ে দিই। রুমি কে সেকথা আমাকে বলা তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ভিতরে খবর পাঠাতেই রুমি এল। ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার বড়ো মেয়ে।

আমি দেখলাম, বোসসাহেবের মেমসাহেব।

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি পরিচয়ের হাসি হাসলেন, তারপর বাপের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী বললেন যেন।

অধ্যাপক হেসে উঠলেন : দূর পাগলি, তুই বলতে পারিস না? তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, রুমি তোমাকে আজ এখানে খেয়ে যেতে বলছে।

দেখলাম, রুমি আগ্রহভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি কিছুতেই 'না' বলতে পারলাম না।

এমন কিছু আয়োজন নয়। খিচুড়ি আর ইলিশমাছ ভাজা। কিন্তু সেই বর্ষার দিনে এই দুটি খাদ্যবস্তুকে অপূর্ব মনে হয়েছিল। বোসসাহেবের মেমসাহেব এমন ভালো রাঁধতে পারেন, আর এত অসংকোচে একজন অনাত্মীয়কে এমন আটপৌরে খাওয়ার পাতে ডাক দিতে পারেন, এবং খাইয়ে এমন আনন্দ পান —সে-ধারণা আমার ছিল না।

বোসসাহেবের মেমসাহেবের সঙ্গে আমার আর কোনো দিন দেখা হয়নি, রুমির সঙ্গেও নয়। কিন্তু আজও যখন ভাবি, কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে এ-দুজন একই লোক।



এখানকার সাহেব ও মেমসাহেবদের কথা বলতে হলে মহাভারত রচনা করতে হয়। এখানে এঁদের বিরল সৌভাগ্য, প্রায় ক্ষণজন্মা অনমুকরণীয় চলন-বলন কখনো পিঠ চাপড়ান কখনো বা চার্জশীট উঁচিয়ে তাড়া করেন। আর কখন যে কোন্‌টা করেন তা পূর্বাহ্নে অনুমান করা স্বয়ং বিধাতাপুরুষেরও অসাধ্য। ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে এনে শাঁখ বাজিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়েছিলেন, তেমনি এঁদেরও অস্তিত্ব বহু-ঘোষণায় সপ্রকট। দেব-দেবীদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব অধিকারের এলাকা আছে, তার বাইরে তাঁরা ম্লান। কিন্তু এখানকার এই ক্ষুদে দেবতারা সর্বতোসঞ্চারী, স্বয়ং ব্রহ্মের মতো সর্বভূতে অধিষ্ঠিত।

এখানকার চাকরিজীবীদের কথা থাক। এমনি বাইরে থেকে যারা শুধু ব্যবসা করবার জন্যে স্টল ভাড়া নিতে আসে তাদেরও এই ক্ষুদে দেবতাদের দৌরাত্ম্য হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়। প্রথমত স্টল ভাড়া পাবার স্বর্গরাজ্য পৌঁছবার পথটি সরল নয়, বহু চোরাগলির গোলকধাঁধায় অত্যন্ত দুর্গম। এবং সেই অসাধ্য সাধনের পরে যদিবা দেবতা খুশি হয়ে বর দেন কিন্তু দাবি ছাড়েন না। স্টল ভাড়া নেবার চুক্তি প্রতি বছরে নতুন করে পাকা করে নিতে হয় এবং আইনের এই বিধানটুকুই দেবতাদের হাতে মোক্ষম একটা অস্ত্র হয়ে থাকে।

অজস্র ঘটনা আমি শুনেছি এবং দেখেছি।

বাইরে থেকে মনে হয়, এখানে ফলাও ব্যবসা করবার অবারিত সুযোগ আছে। কর্তৃপক্ষ এমন নিখুঁত পরিকল্পনা করেছেন যেন প্রতিযোগিতা না থাকে, প্রত্যেকটি ব্যবসায় একচেটিয়া। তিন পাড়ায় তিনটি বাজার, বাজারকে ঘিরে চারপাশে সারি সারি স্টল। সমস্ত দোকানপাট এই সীমানাটুকুর মধ্যেই। চায়ের দোকান, হোটেল ও পানবিড়ির দোকান পর্যন্ত।

তিরিশ হাজার অধিবাসীর পক্ষে স্টলের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয় এবং এই তিরিশ হাজার লোকের প্রাত্যহিক চাহিদার ভগ্নাংশও যদি পূরণ করতে হয় তবে মোটা সেলামী দিয়ে স্টল নিতে পারলেও একবছরের মধ্যেই ঘরের টাকা ঘরে ফিরে আসবে, এমনি একটা ধারণা সকলের ছিল। সুতরাং একেকটি স্টলের জন্যে হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে।

এই হাজার হাজার দরখাস্তকারীর মধ্যে অল্প যে কয়েকজন স্টল ভাড়া পাবার দুর্লভ স্বর্গরাজ্যে শেষপর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে তাদের যে কী মূল্য দিতে হয়েছে তা কল্পনা করা চলে। এবং শুধু সেই একবারই নয়। প্রতিদিন তার জের টেনে চলতে হচ্ছে।

দোকানদাররা নিজেদের মধ্যে বলে, গ্যাঁড়াকল।

কিন্তু তবুও কেউ পাততাড়ি তোলে না। সকলেই ভবিষ্যতের আশা নিয়ে বসে আছে।

এখানে কী ধরনের দোকানদারি চলে তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

এক ডি-টাইপবাসিনী স্থানীয় দোকান থেকে চোদ্দ আনা দিয়ে একলাছি সুতো কেনেন। পরে তিনি এক দু-ফোন্ওলা বাংলোবাসিনীর কাছে কথায় কথায় শুনতে পান যে সেই একই জিনিস তিনি সাড়ে বারো আনায় কিনেছেন। ভদ্রমহিলা ভাবলেন, বিভিন্ন সময়ে কেনার জন্যে বোধ হয় এই দামের তারতম্য। দ্বিতীয়বার এমন একটা যোগাযোগ ঘটে যায় যে একই দিনে দুজনে আবার সেই একই সুতো কেনেন। পরে জানা যায় যে এবারেও আগের মতোই দামের তার-

তম্য ঘটেছে। এবার আর ভদ্রমহিলা চুপ করে থাকতে পারলেন না, দোকানদারের কাছে গিয়ে এর কারণ জানতে চাইলেন। দোকানদার প্রথমে আজে-বাজে কথা বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। পরে ভদ্রমহিলা যখন প্রায় চেঁচামেচি শুরু করবার মতো অবস্থায় আসছেন তখন স্পষ্ট বললে, দেখুন, মিসেস অমুককে যদি কেনা দামে জিনিস বিক্রি না করি তবে আসছে বছর এই স্টল হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই বলে ভাববেন না যে বি-টাইপের কাছে বেশি দাম নিই। আপনার কাছে ন্যায্য দামই নেওয়া হয়েছে।

এর পর ভদ্রমহিলা লজ্জায় আর বলতে পারেননি যে তাঁর টাইপ 'বি' নয়, 'ডি'।

এখানে ব্যবসা করতে এসে এক নতুন ধরনের সেলস্‌ম্যানশিপ শিখতে হয়। মাছওলা বাজারে মাছ বিক্রি করতে বসেছে, তাকেও চোখ রাখতে হয় উর্দিধারী বা ল্যাণ্ডরোভারবাহন কেউ আসছে কিনা। এলে পর তার দাবি সর্বাগ্রগণ্য। কফি হাউসের বেয়ারাগুলো পর্যন্ত জানে কোন্ টেবিলে লম্বা সেলাম ঠুকে মুখ থেকে কথা খসবার আগেই খাদ্য ও পানীয় এনে হাজির করতে হবে আর কোন্ টেবিলের দিকে দৃকপাত না করলেও কিছু যাবে আসবে না। কোনো কিছু লিখিত নিয়ম বা মৌখিক নির্দেশ আছে তা নয়, আপাত দৃষ্টিতে জোরজুলুম কিছু দেখা যাবে না— কিন্তু কুমড়োর ফালি থেকে সিনেমার টিকিট পর্যন্ত সব কিছুই এখানে এইভাবে বিক্রি হয়। পকেটে পয়সা থাকলেই যে-কোনো জিনিসে হাত দেওয়া চলে না। অন্য একটা ছাপ থাকা চাই।

যাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে তারা কোনো দোকানে ঢোকবার আগে বাইরে থেকে ভালো করে দেখে নেয়। যে-যে জায়গায় দেবতাদের ভর হয়েছে তার ত্রিসীমানা মাড়ায় না। লম্বা ফর্দ ও জরুরী প্রয়োজনের তাগিদ থাকা সত্ত্বেও হয়তো যেন কিছু-হয়নি মুখের ভাব করে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ধৈর্যশীলতার পরীক্ষা দিতে অনেকে রাজী আছে। কিন্তু এর মধ্যে যে অপমান-বোধ আছে তা কিছুতেই যেন-কিছু-হয়নি করে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

এই যেন-কিছু-হয়নি মুখের ভাব করে অনেক কিছুই এখানে সহ্য করতে হয়। হয়তো অফিসারের বাড়িতে টি-পার্টি। রেশনে কার্ডপিছু একপো চিনি, ব্ল্যাকে এক টাকা চোদ্দ আনা সের। আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে অফিসার বললেন, কি করি বলো তো হে, কিছু চিনি চাই যে।

তখন যেন-কিছু-হয়নি মুখের ভাব করে আপনাকে বলতে হবে, চিনি পাচ্ছেন না স্যার? কত চিনি চাই স্যার? অঢেল চিনি। আট আনা সের স্যার, আট আনা।

কিংবা অফিসার হয়তো আপনাকে একেবারে কৃতার্থ করে দিয়ে অতি ঘনিষ্ঠ স্বরে জিজ্ঞেস করেন, আপনি সকালে বেড়াতে যান না? মর্নিং ওয়াক্?

আপনাকে বাধ্য হয়ে বলতে হবে, যাই স্যার।

বেড়াতে বেড়াতে স্টেশনের দিকে চলে যাবেন, বুঝেছেন?

আপনাকে আবার বলতে হবে, তাই তো যাই স্যার।

আকর্ণ হেসে অফিসার বলবেন, তাহলে শুনুন, ওখান থেকে সামনে দাঁড়িয়ে দুইয়ে আমার জন্যে এক সের করে দুধ আনবেন তো।

তারপর থেকে যেন-কিছু-হয়নি মুখের ভাব করে প্রত্যহ অফিসারের বাড়ি থেকে ঘটি নিয়ে এক সের দুধ আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে। মাসের শেষে অফিসার গয়লার টাকা দিতে ভুলে যাবেন। লজ্জায় চাইতে না পেরে সেই টাকাও শোধ করতে হবে পকেট থেকে।

তাই বলে ভাববেন না যে আপনার জন্যে অফিসারের কোনো দরদ নেই। দশটার সময় আপিসে এসে আপনি হয়তো সবেমাত্র ফাইলপত্র নিয়ে বসেছেন এমন সময় অফিসারের জরুরী তলব পড়বে। হন্তদন্ত হয়ে আপনি ছুটে যাবেন। না, আপিসের কোনো কাজ নয়, যে জরুরী চিঠিগুলোর জবাব বারোটার মধ্যে যাওয়া চাই তার নোট নেবার জন্যেও ডাকেননি, শুনবেন অত্যন্ত বাৎসল্যভরা স্বরে অফিসার জিজ্ঞেস করছেন, আপনি ঘুঁটে কেনেন কোত্থেকে?

ঘুঁটে স্যার? কী বলবেন বুঝতে-না পেরে আপনি হয়তো আমতা আমতা করেন।

শুনুন, আমার বাড়িতে অনেক ঘুঁটে বাড়তি হয়ে গেছে। আপনার যা ঘুঁটে দরকার আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন।

খবরটা পেয়ে যেন কৃতার্থ হয়ে গেছেন এমনি একটা মুখের ভাব করে আপনাকে রাজী হতে হবে। সন্ধের সময় আপসি থেকে বাড়ি ফিরে অন্য সমস্ত কাজ ফেলে আপনাকে ছুটতে হবে অফিসারের বাড়ি। ঘুঁটে আনার জন্যে। দাম? অফিসারের ঘুঁটে! বাজার দরের সঙ্গে একটু ফারাক হবে বইকি! ক-শো নেবেন আপনি? অফিসারের ঠিক যতো-শো বাড়তি ঘুঁটে আছে তার একটি কম ঘুঁটে নিলেও আপনার উনুনে হাঁড়ি চড়বে না এমন ভাব দেখাতে হবে।

গ্যাড্‌গিল কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে দুই বন্ধুতে চায়ের ক্যান্টিনে বসে আলোচনা হচ্ছিল। মাগ্‌গি-ভাতার কিছুটা অংশ মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশ সরকার বিবেচনা করছেন এই ধরনের একটা খবর ছিল সেদিনের কাগজে। কথা বলতে বলতে একজন আক্ষেপ করে বলে উঠল, আর ভাই, এখানকার চাকরিতে ডি-এ বাড়া-কমা একই কথা। পঞ্চাশ টাকা ডি-এ, তার তিরিশ টাকাই গুণাগার।

বন্ধুটি অবাক হল, সে কী?

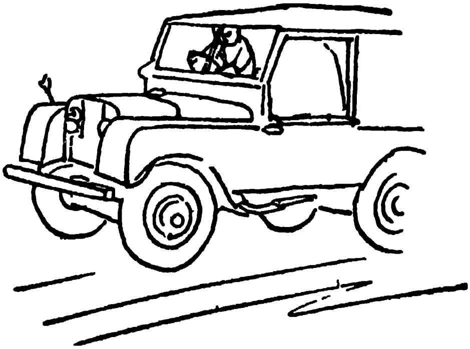
আগে প্রভুর দুটো গোরু ছিল, তখন সপ্তাহে একশো ঘুঁটে কিনতে হত। এখন প্রভুর চারটে গোরু, সপ্তাহে তিনশো ঘুঁটে। শালার গোরুগুলো কী যে খায়, রাশি রাশি গোবর ছড়াচ্ছে।

বলে দিলেই পারো যে অত ঘুঁটে তোমার দরকার নেই।

ওরে বাবা, তার উপায় আছে? সঙ্গে সঙ্গে আইটেম নাম্বার সিকস। এখানে পেঁপে কেউ কিনে খায় শুনেছ? আমাকে কিনতে হয়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, সব-কটি পেঁপে গাছের গোড়া সাবড়ে দিয়ে আসি।

আইটেম্ নাম্বার সিকস্ হচ্ছে রিমুভাল্ ফ্রম সার্ভিস, চার্জশীটের একটা হুমকি। প্রত্যেকটি আপিসে রাশি রাশি ছাপানো ফর্ম আছে। হরির লুটের বাতাসার মতো প্রত্যেককে ছয়ের নম্বর আইটেম চিহ্নিত এক-একটা চার্জশীট মাঝে মাঝে পকেটস্থ করতে হয়। একশোটা রোগী মরলে তবে যেমন ডাক্তারিতে হাত পাকে, তেমনি গোটা সাতেক চার্জশীট পকেটস্থ হবার পরে এখানকার চাকরি অনেকটা ধাতস্থ হয়ে আসে।

মুঠোয় ভরা পৃথিবী



অফিসারদের খাস কামরায় ছুটো করে ছবি আছে। গান্ধী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের। খাস কামরায় অফিসার যে-চেয়ারে বসেন, তার ডান দিকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণাকুণি গান্ধীর ছবি আর বাঁদিকে প্রায় তিরিশ ডিগ্রী কোণাকুণি রাজেন্দ্রপ্রসাদের। কোনো যে সূক্ষ্ম মাপ আছে তা নয়, এমন ভ বে ছবিছুটো টাঙাতে হবে যেন অফিসার মুখ তুলেই দেখতে পান ছু-দিক থেকে ছুজনে তাঁর কর্মব্যস্ততাব দিকে তাকিয়ে খুশির হাসি হাসছেন। যে ঠিকাদার এই ছবি ছুটো সাপ্লাই করে বড়োলোক হয়েছে তার ব্যবসা-জীবনের শুরু ইংলণ্ডেব রাজা ও ভারতের বড়োলাটের ছবি নিয়ে। সেই ছুই মূর্তিই ছিল অত্যন্ত রাশভারী ও গম্ভীর, যেদিক থেকেই তাকানো যাক না কেন কিছুতেই চোখে চোখ পডত না। সেদিক থেকে গান্ধী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ছবি ছুটোই একদিন এক ভদ্রলোকের দাঁত-ছিরকুটি লাগিয়ে দিয়েছিল। এখানে অফিসাররা প্রায়ই খাস-কামরা বদল করে। একবার এমনি এক কামরা বদলের পর এক অফিসার মুখ তুলে দেখতে পান গান্ধী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে না তাকিয়ে টেবিলের ওপরকার তিনটি টেলিফোনের দিকে মুখ ফিরিয়ে আঁতকে রয়েছেন। ঘর সাজাবার ভার যার ওপর সঙ্গে সঙ্গে তার জরুরী তলব পড়ল—

আপনাকে আমি চার্জশীট দেব।

এ-কথার উত্তরে জিজ্ঞেস করা চলবে না, কেন স্যার? চুপ করে পরের কথার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

এ-ছবিটা একটু সামনে আসবে, ওটা আরেকটু পেছনে। আপনার কোনো সেন্‌স্ অব বিউটি নেই।

সেন্‌স্ অব বিউটির অভাবটা যে কোথায় সেটা বোঝবার জন্যে সেদিন সন্ধ্যায় কামরার সবকটা আলো জ্বালিয়ে দিয়ে ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় ঘণ্টা-খানেক মাথার চুল ছিঁড়তে হয়েছিল। গান্ধীকে দু-ফুট এগিয়ে আনা হল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ পেছিয়ে গেলেন আড়াই ফুট এবং সেনস্ অব বিউটির এই সূক্ষ্ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরে সে-যাত্রা ভদ্রলোক ছ-নম্বরের আইটেম থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

গান্ধী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের ছবি সম্পর্কে যেমন অফিসারদের সেনস্ অব বিউটি, তেমনি প্রস্রাবখানা সম্পর্কে তাঁদের সেন্‌স্ অব ডিসেন্‌সি। একবার এক অফিসার বাথরুম থেকে বেরিয়েই ভয়ানক হাঁকডাক শুরু করে দিলেন। বাথরুম খবরদারি করবার ভার যার ওপর, সে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল।

আপনাকে আমি চার্জশীট দেব।

এটা অফিসারের কথার মাত্র, লোকটি মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অফিসারদের বাথরুমে কর্মচারীরা যাতে না ঢোকে সেদিকে আপনি নজর রাখবেন না?

এবার লোকটি বলল, না স্যার, আমি এখানেই থাকি, কাউকে তো ঢুকতে দেখিনি।

দেখেননি? আচ্ছা আসুন। বলে অফিসার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রস্রাব বেরোবার নলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই দেখুন।

লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

দেখতে পাচ্ছেন, হলদে পেচ্ছাব? অফিসাররা হলদে পেচ্ছাব করে?

এই অপূর্ব বিশ্লেষণ ও অকাট্য প্রমাণকে বিনা বাক্যে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।

তারপর আছে সেনস্ অব এটিকেট। রাস্তায় চলতে চলতে ল্যাণ্ডরোভার দেখা-মাত্র দাঁড়িয়ে পড়ে সেলাম ঠোকা। মাঝে মাঝে এমন হয় যে উর্দিধারী সোফার ফাঁকা ল্যাণ্ডরোভার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে,—এসব ক্ষেত্রে সেলামটা ফাউয়ের হিসেবে পড়ে। ইংরেজ আমলে জেল খেটেছে এমন দু-একজন কর্মচারী এখানে আছে। তারা বলে, ল্যাণ্ডরোভারে কে আছে কে নেই ওসব দেখতে যেও না। এ হচ্ছে জেলখানার সরকার সেলাম। ল্যাণ্ডরোভার দেখলেই সেলাম ঠুকবে। আর তাই হয়। কোন্ অফিসারের শাশুড়ী বিকেলবেলা হাওয়া খাবার জন্যে ল্যাণ্ডরোভার চেপে বেরিয়েছেন, তিনি দূর থেকে সেলাম কুড়োতে কুড়োতে যান। এমনকি অফিসারের খানসামা যদি কোনো দিন ল্যাণ্ডরোভার চেপে বাজার করতে যায়, তার কপালেও সেলাম জোটে। এই ল্যাণ্ডরোভার এখানে এক দৌরাত্ম্য বিশেষ। যখন তখন যেখানে সেখানে ল্যাণ্ডরোভার ছুটছে। মাঝে মাঝে সার্কুলার জারি করে প্রচার করা হয় কি কি প্রয়োজনে বিভাগীয় যানবাহন ব্যবহার করা চলতে পারে। সাবর্ডিনেট আপিসগুলোতে এই সার্কুলার নোট করবার জন্যে সযত্নে পাঠানো হয়। কিন্তু যাঁদের নোট করা দরকার তাঁরা এসবের ধার ধারেন না। কোন্ অফিসার-গিন্নী ষোলো মাইল দূরের জংশন শহরে বাজার করতে যাবেন বা কারও শখ হয়েছে কল্যাণেশ্বরী বেড়াতে যাবে, অফিসার-দুহিতার সঙ্গে ভাবী জামাতা কোর্টশিপ করতে আসবে —সর্বত্র ল্যাণ্ডরোভার ছুটছে। সরকারী তেল, সরকারী ড্রাইভার। এই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের তেলের খরচ ও ড্রাইভারের ডিউটির গোঁজামিল যে কি করে সামলানো হয় তা গবেষণার বিষয়।

অবশ্য গবেষণার বিষয় আরও অনেক আছে। হাজার হাজার টাকার ফার্নি-চার 'রিজেক্টেড' লেবেল আঁটা হয়ে কি করে রাতারাতি পাচার হয়ে যায় তাও নিশ্চয় গবেষণার বিষয়। পাঁচ-ছশো টাকার ক্ষুদে অফিসারের গ্যারেজে দু-

বছরের চাকরির মধ্যেই কি করে ঝকঝকে নতুন গাড়ির আবির্ভাব হয়, সেই কেঁচো খুঁড়তে গেলে অনেক বড়ো বড়ো সাপ বেরিয়ে পড়বার সম্ভাবনা। ডেলি-ওয়েজ ছুতোর-কুলিরা সাহেবপাড়ায় কাঠচেলা করে ও মাটি কুপিয়ে প্রোজেক্টের কোন্ স্বর্গদ্বারের সিঁড়ি বানায় সে-হিসেব কে রাখবে?

এখানে একটি বেতার স্টেশন আছে। জেনারেল ম্যানেজারের আপিসের পেছন দিকে তিনতলা ছাদের ওপরে চল্লিশ ফুট উঁচু এরিয়াল মাস্ট। সাদা অ্যালু-মিনিয়ামের পেইণ্ট সূর্যের আলোয় ঝকঝক করে, চারদিকে আট-আটটা গাই-ওয়্যারের জটিল বেড়াজাল দেখে মনে হয় যেন বেতার-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক কিছু একটা ব্যাপার এখানে সংঘটিত হয়েছে। সারা প্রোজেক্ট থেকে ওই এরিয়াল মাস্ট দেখা যায়। হস্‌পিটাল রোডের অশ্বত্থ গাছের চেয়ে উঁচু, অ্যাডমিনিস-ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর পাশে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের সার্চ পোস্টেরও মাথা ছাপিয়ে উঠেছে। পেছনেই কারখানা, গুডস্ ইয়ার্ডের মস্ত ক্রেন সামনে পেছনে ছুটোছুটি করে, মস্ত রানওয়ে—কিন্তু এরিয়াল মাস্টের আকাশছোঁয়া ঘোষণার পাশে সব কিছু ম্লান। আসলে কিন্তু কিছুই নয়। মাত্র কুড়ি ওয়াটের একটা পোর্টে-বল্ সেট্ ষোলো মাইল দূরের জংশন শহরের সঙ্গে কাজ করে। যুদ্ধের পরে আমেরিকানদের ফেলে-যাওয়া মালপত্রের মধ্যে এগুলো ছিল। খুব ভালো আব-হাওয়াতেও লিলুয়ার জোরালো রিসিভারে এখান থেকে পাঠানো খবরাখবরের একটি বর্ণও ধরা পড়বে না। মাত্র ষোলো মাইল দৌড়, মিটারব্যাণ্ডের পরিধি তিন হাজার থেকে ছয় হাজার কিলো-সাইকল্স্—কিন্তু তার আয়োজন বিরাট। চার ফুট লম্বা একটা ডাণ্ডা দিয়ে যেখানে কাজ চলে সেখানে তিন তলার ছাদের ওপরে চল্লিশ ফুট উঁচু মাস্ট! এই বেতার স্টেশন সারা প্রোজেক্টের নিখুঁত এক প্রতিচ্ছবি। এরিয়াল মাস্ট দুটো সর্বাধিপতি অফিসারবাহিনী. জাঁকজমক ও পারিপাট্যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আসলে কিন্তু কিছুই নয়। প্রকাণ্ড একটা ব্লাফ—ভাঁওতা!

গানের সুরের মতো ঘোমটাটানা একটি মুখ



৩১শে ডিসেম্বর পুরনো বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো কিছু কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গেল। তার মধ্যে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেণ্টের লোক প্রায় আড়াই-শো জন। এরা যখন প্রোজেক্টে প্রথম চাকরি করতে আসে তখন এখানে এমন সুন্দর সুন্দর কোয়ার্টার ও রাস্তাঘাট ছিল না। সাপ ও বিছের ভয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁবুর মধ্যে রাত কাটাতে হয়েছে। তিন বছর চাকরি করার পর এক কথায় চোদ্দ দিনেব নোটিশে ছাঁটাই হয়ে গেল।

ছাঁটাই হবার পরে এই আড়াই-শো লোক একদিন একটা মিছিল বার করেছিল। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ বলেনি, অফিসাবদের ঘেরাও করেনি, শুধু দাবি জানিয়েছিল—ছাঁটাই করা চলবে না! সঙ্গে সঙ্গে এক রাতের মধ্যে সিকিউরিটি পুলিশ প্রত্যেককে আলাদা আলাদা নোটিস জারি করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রোজেক্ট ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল।

টেলিফোন ডিপার্টমেণ্টের কাজ তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ছাঁটাই হবার কথা নয়, তবুও একজন ছাঁটাই হয়ে গেল। এবং এই অদ্বিতীয়টি হচ্ছে অনন্ত। কর্তৃপক্ষ নাকি সারা প্রোজেক্টের খালাসীদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। সিনিয়রিটি হিসেবে এই তালিকায় নাকি খালাসীদের নাম লেখা হয়েছে। তবে কে কত বছর চাকরি করেছে সেই হিসেবে সিনিয়রিটি নয়; কর্তৃপক্ষ একবার একটা মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছিলেন, সেই পরীক্ষার ফলাফলের হিসেবে সিনিয়রিটি। দেখা গেল, এই মৌখিক পরীক্ষায় পাস করবার রাস্তায় অনেক চোরাগলির শর্টকাট আছে। বহু আনকোরা নতুন লোক টগবগিয়ে তালিকার

শীর্ষদেশে চেপে বসল আর বহু কাজ-জানা অভিজ্ঞ লোক পড়ে রইল মুখ থুবড়ে। অনন্ত এই শেষোক্তদের দলে। ম্যাট্রিকপাশ, টেলিফোন অপারেটরের কাজ-জানা খালাসী সিনিয়রিটি পরীক্ষার প্রথম চোটেই কি করে যে একেবারে বাতিল হয়ে গেল সেটা বাইরে থেকে রহস্য মনে হলেও এখানে এসে কিছু দিন চাকরি করার পর স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

ছাঁটাই হবার পরে অনন্ত বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, কোথায় ভুল হয়েছে। সুতরাং ভুল শুধরে নিতে তার খুব বেশি সময় লাগেনি। একদিন সন্ধের সময় চোখেমুখে বেশ একটা খুশির ছাপ নিয়ে আমার কোয়ার্টারে হাজির। বললে, একটা ভালো খবর আছে, স্যার।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, নিশ্চয়ই চাকরিসংক্রান্ত কোনো খবর, নইলে হঠাৎ এত খুশির কারণ কি? জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর?

ও বললে, আমি নতুন একটা চাকরি পেয়েছি স্যার।

এখানে তিনটি কো-অপারেটিভ স্টোর্স আছে। বাবুপাড়ায়, কারিগরপাড়ায় আর মজদুরপাড়ায়। এই তিনটি স্টোর্স পরিচালনার দায়িত্ব জেনারেল ম্যানেজারের সেক্রেটারির। বাবুপাড়ার স্টোর্সের ম্যানেজার হয়েছে অনন্ত। এবার আর খালাসীর কাজ নয়, বসে বসে কেরানির মতো চাকরি, মাইনেও সাধারণ একজন কেরানির মতোই। শেষপর্যন্ত সে যে ক্লাস থ্রী কর্মচারীর সমমর্যাদাসম্পন্ন হতে পেরেছে সেই ভেবেই অনন্ত আহ্লাদে আটখানা।

অনন্তর জন্যে আমি নিজেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখানে সিনিয়র সাবর্ডিনেটদের কাজের দায়িত্ব আছে কিন্তু লোক বাছাই করার ক্ষমতা নেই। অনন্ত ছাঁটাই হবার পরে সেই শূন্য পদে অন্য বিভাগ থেকে খালাসী বদলি হয়ে এল। টেলিফোনের কাজে অনন্তর টেকনিকাল দক্ষতা আছে, এই কথাও কর্তৃপক্ষ শুনতে রাজী নন। কারণ ৩০-৩৫ গ্রেডের খালাসী সরকারী শ্রেণীবিভাগ অনুসারে অদক্ষ শ্রমিকের পর্যায়ে পড়ে, সুতরাং টেকনিকাল দক্ষতার প্রশ্ন অবান্তর।

স্বভাবতই অনন্তর চাকুরি নতুন হয়েছে শুনে আমি আন্তরিক খুশি হয়েছিলাম। কথায় কথায় বলেছিলাম, এবার তাহলে আমাদের একদিন পেটপুরে খাওয়াতে হবে কিন্তু।

কথাটা বলে আমি ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু অনন্ত ভোলেনি। মাস ছয়েক পরে অনন্ত একদিন আমাকে খাওয়াল। ইতিমধ্যে সে বাবুপাড়ার স্টোর্স থেকে কারিগর-পাড়ার স্টোর্সে বদলি হয়ে এসেছে। 'বি' টাইপ কোয়ার্টার পাবার পরে বৌ আর মা-কে নিয়ে এসেছে দেশ থেকে। তারপর নিজের এই ছোট সংসারটুকু একটু গুছিয়ে নিয়ে ছ-মাস আগেকার কথায়-কথায়-বলা আমার একটা ইচ্ছাকে পূরণ করবার জন্যে অগ্রসর হয়েছে। আয়োজন খুব বেশি নয় কিন্তু এমন একটা মাধুর্যমণ্ডিত ঘরোয়া পরিবেশ যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। অনন্তকে দেখে সেদিন আমার আরেকবার মনে হয়েছিল, জীবনে সুখী হবার জন্যে খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন হয় না। সব্‌জি আর ফুলের বাগান ঘেরা ছোট একটি বাড়ি, স্নেহ-পরায়ণা মায়ের অতন্দ্র দৃষ্টি আর গানের সুরের মতো ঘোমটাটানা একটি মুখ। অনন্তর চেয়ে সুখী কে?

অনন্তর বৌ আমাকে প্রণাম করে বললে, মাঝে মাঝে আসবেন দাদা।

কথাটা এমন কিছু নয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। আমি হোটেলে খাই, একা থাকি, এ-ধরনের জীবনেই আমি অভ্যস্ত। কিন্তু সেদিন সেই আনতমুখী নববধূর ছোট্ট একটি কথায় আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, আমার এই অনাত্মীয় প্রবাসজীবনে কত বড়ো একটা ফাঁক ছিল আর কী আশ্চর্যভাবে তা ভরাট হয়ে গেল।

বললাম, নিশ্চয়ই আসব বোন। কিন্তু একটা শর্ত আছে।

কি?

যতোবার আসব চা খাওয়াতে হবে কিন্তু!

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন ভারি মজার কথা শুনেছে।

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে একদিন রাত প্রায় দশটার সময় অদ্ভুত একটা

টেলিফোন কল্ পেলাম। আমার কোয়ার্টারের টেলিফোন দিনে রাতে অনবরত বাজে। কার টেলিফোনে কড়্কড়্ আওয়াজ হচ্ছে, কে দু-মিনিট রিসিভার ধরে থেকেও অপারেটরের জবাব পায়নি, কোথায় দুজনের কথাবার্তা শেষ না হতেই লাইন কেটে গেছে—এমনি সব সংবাদ। আমিও বাঁধাধরা গদে জবাব দিয়ে চলি।

সেদিন রাত দশটার সময়ে আমি এই ধরনেরই কোনো অভিযোগ শুনতে পাব আশা করেছিলাম। কিন্তু জবাব দিতেই শুনতে পেলাম, খুব মোটা একটা গলায় দ্রুতস্বরে কে যেন বলছে, আপনি শিগগির একবার বেঙ্গল পুলিসের থানায় আসুন, বিশেষ জরুরী দরকার। তারপরেই রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

কী করব ভাবতে একটু সময় লাগল। হঠাৎ এত রাতে আমাকে থানায় যেতে বলছে কেন? পুলিস কর্তৃপক্ষ নয়, তারা এমন সন্ত্রস্তভাবে ডাকে না। যাই হোক, শেষপর্যন্ত রওনা হলাম থানার দিকে।

থানার আপিসঘরে ঢুকে দেখি, অনন্ত মুখ কালি করে বসে আছে। আমাকে দেখে ভয়ানক অবাক হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অনন্ত তুমি এখানে, কি ব্যাপার?

দাদা! বলে অনন্ত ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

ইতিমধ্যে থানার ইন্‌স্পেক্‌টরটি হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসেছে। আমাকে বললে, আপনার কী চাই?

আমার কি খেয়াল হল বললাম, আমি টেলিফোনটা দেখতে এসেছি।

কেন, আমাদের টেলিফোন তো ঠিক আছে!

না, ঠিক নেই, গত দু-ঘণ্টা ধরে আপনাদের টেলিফোন থেকে জবাব পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্‌স্পেক্‌টরটি অবাক হয়ে বললে, সে কি? গত দু-ঘণ্টায় আমি অন্তত বার পাঁচেক টেলিফোনে চক্রবর্তী সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি।

চক্রবর্তীসাহেব হচ্ছেন জেনারেল ম্যানেজারের সেক্রেটারি।

কথা বলতে বলতে টেলিফোনটা আবার ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল। ইন্‌স্‌পেক্‌টর ছুটে গিয়ে জবাব দিলে। আমার মনে হল, এবারেও চক্রবর্তীসাহেবই কথা বলছেন। আমি একপক্ষের কথা শুনেছিলাম, কিছু কিছু কথা এখনো আমার মনে আছে। অনেকটা এই রকম : হ্যাঁ স্যার সে আর আপনাকে বলতে হবে না স্যার না স্যাব, জামিন হবে না কাল সকালেই চালান দেব

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো অনন্তকে বললাম, চলো অনন্ত, বাড়ি যাবে তো?

অনন্ত কি যেন বলবার চেষ্টা করেছিল। তার আগেই ইন্‌স্‌পেক্‌টর বলে উঠল, হি ইজ আন্‌ডার অ্যারেস্ট।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

শেষ পর্যন্ত জানা গেল। বাবুপাড়ার কো-অপারেটিভ স্টোর্সে নাকি সাতশো টাকাব হিসেবের গরমিল পাওয়া গেছে। আর অনন্ত ছিল সেখানকার ম্যানেজার। সুতরাং তহবিল তছরূপের অভিযোগে পুলিস অনন্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

চক্রবর্তীসাহেবের এত ঘন ঘন টেলিফোন করার অর্থটা এতক্ষণে আমার কাছে পরিষ্কার হল। কিন্তু আমাকে টেলিফোন করল কে? যতোদূর বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা চুপি চুপি সেরে ফেলবার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

কিন্তু অনন্তর এমন শুভার্থী কে আছে?

অনন্তকে জামিনে খালাস করিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফেরবার পথে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি অনন্ত?

অনন্ত হঠাৎ সেই রাস্তার ওপরেই উবু হয়ে বসে দু-হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে, আমি কিছু জানি না দাদা! কোথা থেকে কি হল আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। স্টোর বন্ধ করে ফিরছি, রাস্তা থেকে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। আমার কি হবে দাদা?

সে কী উচ্ছ্বসিত কান্না! কোনো পুরুষমানুষ যে এভাবে কাঁদতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। আমাদের বাঁ দিকে কারখানা, ডান দিকে বাঁধ। বাঁধ মানে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নিচু জমি, একদিকে উঁচু দেওয়ালের আড়াল, অন্য দিকে এক জটিল পয়ঃপ্রণালীর সংযোগপথ। সারা প্রোজেক্টের বৃষ্টির জল এখানে এসে জমা হয়। প্রোজেক্টের ব্লু-প্রিণ্টে এই অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করে লেখা আছে, 'ড্যাম'। এই ইংরেজি নামেই এটি পরিচিত, বাঁধ বললে অনেকেই বুঝতে পারবে না। এই জলের সঞ্চয় জরুরীকালীন অবস্থার জন্যে, অনেক দূরের অজয় নদীর বালি খুঁড়েও যেদিন জল পাওয়া যাবে না সেদিন এই জল প্রোজেক্টের তিরিশ হাজার লোককে বাঁচিয়ে রাখবে।

তখন কারখানায় নাইট-শিফ্‌ট চালু হয়নি। উঁচু উঁচু সার্চপোস্টের আলোয় উদ্ভাসিত নিস্তব্ধ কারখানা, বাঁধের জলে আলো পড়ে চিক্‌চিক করছে, ওপারে ঘুমন্ত বাবুপাড়া, উঁচুনিচু রাস্তায় মালার মতো আলো, আর সামনে পেছনে বিস্তীর্ণ জলরাশি।

অনন্ত কাঁদছে আর বলছে, আমার কি হবে দাদা?

আর কোনো শব্দ নেই। কারখানার গা ঘেঁষে সেন্ট্রাল পাওয়ার হাউস। নিচু শেড, কিন্তু তবুও চোখে পড়ে শেডের একটা প্রান্ত যেন ফোড়ার মতো ফুলে উঠেছে। আগামী কাল ভোর ছ-টায় ঐ ফোড়া ককিয়ে উঠে সারা প্রোজেক্টের লোককে জাগিয়ে তুলবে। আর তখন বোঝা যাবে, ওটা ইলেকট্রিক সাইরেন।

অনন্তকে হাত ধরে তুলে বললাম, চলো বাড়ি যাই।

অনন্ত বললে, আমি আর বাড়ি যাব না দাদা। এ মুখ আর কাউকে দেখাব না।

ছিঃ অনন্ত, ছেলেমানুষি কোরো না, চলো—

কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে অনন্ত একেবারে ভেঙে পড়ল, বললে, দাদা, আজ রাতটুকুর মতো আপনার কোয়ার্টারে আমাকে থাকতে দিন। আজ আমাকে বাড়ি যেতে বলবেন না।

আমি বললাম, আচ্ছা তাহলে তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি তোমায় বাড়িতে বলে আসি।

অনন্ত থাকে চল্লিশ নম্বর রাস্তায়। ওর বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ, তারপরে কারখানার রেলের সাইডিং আর তারও পরে প্রকাণ্ড অ্যাড্‌মিনিসট্রেটিভ বিল্‌ডিং। বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালে লেভেলক্রসিং-এর উঁচু রাস্তাটুকু দেখা যায়। অনেক দূর থেকেই দেখলাম, বারান্দায় আবছায়া দুটি মূর্তি সেই দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে প্রথমে চিনতে পারেনি। ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে চিনতে পেরেও কেউ কথা বলতে পারল না। দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠায় গলার স্বর আটকে গেছে।

আমি বললাম, অনন্তকে হঠাৎ আপিসের জরুরী কাজে বাইরে চলে যেতে হয়েছে। স্টেশন থেকে আমাকে টেলিফোনে খবর জানাল।

জীবনে আমাকে অনেকবার নানা কারণে বানানো কথা বলতে হয়েছে। কিন্তু এতটুকু বিবেকের দংশন অনুভব না করে, এত খোলা মন নিয়ে এত বড়ো মিথ্যে আর কোনো দিন বলেছি বলে মনে পড়ে না। মনে হয়েছিল, সত্যি কথা বললেই পাপ হত।

আনতমুখী নববধূ বললে, দাদা এবার তাহলে বসুন, চা তৈরি করি।

কিছুতেই বলতে পারলাম না, আজ থাক। অনন্তর মা শুতে চলে গেলেন। মেয়েটি স্টোভ এনে ধরাতে বসল। কিছুক্ষণ পরেই তামার পাতের সঙ্গে চামড়ার ঘর্ষণের অদ্ভুত একটা শব্দ, চুড়ির সঙ্গে চুড়ির ঠোকাঠুকির ধাতব ঝংকার, দপ করে স্টোভটা জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ আওয়াজ, চামচ নাড়ার ঠুনঠুন শব্দ, আর হঠাৎ একটা ইঞ্জিনের হুইশ্‌ল্‌। রাত বারোটার এক্সপ্রেস ট্রেন কলকাতার দিকে রওনা হচ্ছে।

চায়ের কাপটা আমার দিকে এগিয়ে হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, বাড়িতে আসবার সময় ছিল না বুঝি ?

আমি তাকিয়ে দেখলাম। গানের সুরের মতো ঘোমটাটানা একটি মুখ। বললাম, না বোন, একেবারেই সময় ছিল না। সাহেবের সঙ্গে একই গাড়িতে রওনা হতে হল কিনা। কাল সকালেই ফিরে আসবে।

রাতে কোয়ার্টারে ফিরে অনন্তকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। সেদিন রাতে অনন্তর কাছে যা শুনেছি এবং পরে যা জানতে পেরেছি তাতে আসল ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

কো-অপারেটিভ স্টোর্সের ম্যানেজারের পদ সরকারী পদ নয়, সুতরাং সরকারী চাকরির নিয়মকানুন এখানে খাটে না। চক্রবর্তীসাহেবই সর্বেসর্বা, তিনি খুশিমতো ম্যানেজার নিয়োগ করেন। এবং এই করুণাপ্রদর্শনের মূল্য হিসেবে তাঁর কিছু মাসিক বরাদ্দ আছে, চাকরি বজায় রাখতে হলে ম্যানেজারকে তা দিতে হবে। স্টোর্সের ম্যানেজারদের জমানো টাকা থাকে না, মাইনেও এমন কিছু বেশি নয়—সকলেই স্টোর্সের হিসেবে গোঁজামিল দিয়ে চক্রবর্তীসাহেবের খাঁই মিটিয়েছে। অনন্ত অনেক কিছু জানত কিন্তু এটুকু জানত না। চক্রবর্তীসাহেবের দাবির বহর শুনে সে পিছিয়ে যায়। চক্রবর্তীসাহেব দু-মাস অপেক্ষা করে দেখেন, তারপরেই বাবুপাড়া থেকে কারিগরপাড়ায় বদলি এবং মাস চারেকের মধ্যে পুরনো হিসেবপত্রের পাতা বেমালুম পালটে ফেলা এবং সাতশো টাকার তহবিল তছরূপের অভিযোগ। চক্রবর্তীসাহেব ইচ্ছে করলেই অনন্তকে সরিয়ে মনের মতো নতুন ম্যানেজার বসাতে পারতেন। কিন্তু ছারপোকার কামড় খেয়ে লোকে যেমন ছারপোকাকে টিপে মেরে ফেলতে চায় তেমনি অনন্তর মুখে চুন-কালি মাখিয়ে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো বন্ধ করতে চেয়েছেন। রাতারাতি গ্রেপ্তার করিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করেছিলেন যেন জামিন দেবার পর্যন্ত কেউ না থাকে। কেস টিকুক আর না টিকুক, হাজতবাস তো করতে হবে।

কিন্তু অনেক খোঁজখবর নিয়েও আমি জানতে পারিনি, সে রাতে আমাকে কে টেলিফোন করেছিল।

এই মামলা শেষপর্যন্ত কোর্টে ওঠেনি। দিন তিনেকের মধ্যেই অনন্ত কোথেকে যেন সাতশো টাকা যোগাড় করে নিয়ে আসে। সেই টাকা পেয়ে চক্রবর্তী-সাহেব মামলা প্রত্যাহার করে নেন।

তারপরেই অনন্ত প্রোজেক্ট ছেড়ে চলে গেছে। যাবার আগে একদিন সন্ধের পরে সস্ত্রীক আমাকে প্রণাম করতে এসেছিল। গানের সুরের মতো ঘোমটাটানা একটি মুখ। কিন্তু প্রণাম করবার সময় নিরাভরণ রিক্ত হাতদুটির দিকে তাকিয়ে আমি একটিও কথা বলতে পারিনি।

শিবঠাকুরের আপন দেশে



চাকরি নেবার কিছু দিন পরেই শম্পা তার মাকে নিয়ে 'বি'-টাইপ কোয়ার্টারে উঠে এল। শম্পার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে শম্পার মার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল আমার। আজও শম্পার মা-র কথা ভাবলে আমার মনে হয়, বাংলাদেশের চিরকালের গৃহিণী এবং চিরকালের মা-র যদি কোনো রূপ থাকে তবে তিনি হচ্ছেন শম্পার মা।

একদিনের কথা মনে আছে। শম্পাদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে টেলিফোনের নতুন লাইন টানা হচ্ছিল। আমি তদারক করছিলাম। একটা জটিল ফল্ট সারাতে গিয়ে কখন দুটো বেজে গেছে টের পাইনি। তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছি, হঠাৎ দেখি কুণ্ঠিত পায়ে শম্পা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

আপনাকে মা ডাকছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

শম্পা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম, জানলেও ও বলতে চায় না।

শম্পাদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম, শম্পার মা আমার জন্যে রান্না করে থালা সাজিয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি দু-একবার আপত্তি জানালাম, তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন।

রান্না করাটা যে একটা আর্ট সেই ধারণা আমার হয়েছে শম্পার মাকে

দেখে। একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কাটা বেগুনে নুন-হলুদ মাখিয়ে গরম তেলে ভাজলেই বেগুন ভাজা হয়, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু শম্পার মার বেলায় দেখেছি, এই সাধারণ প্রক্রিয়ার মধ্যেও বিশেষ একটু হিসেব আছে। ভোক্তার খেতে বসার সময়ের হিসেব রেখে তিনি এমনভাবে বেগুন ভাজতেন যেন খাদ্যবস্তুটি কবোষ্ণ অবস্থায় পাতে এসে পড়ে। এমন কিছু সূক্ষ্ম হিসেব নয়, এমন কিছু জটিল প্রক্রিয়াও নয়—কিন্তু এমন নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে তিনি এই দিকে নজর রাখতেন যে অবাক হতে হত।

আমার মনে হয়েছে, মেজাজের দিক থেকে শম্পার মা ক্লাসিক লেখকদের সমধর্মী। ডিটেল্‌স-এর দিকে এত বেশি নজর, যে-কোনো কাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও নিখুঁত করবার জন্যে এমন অখণ্ড মনোযোগ—তুলনা দিতে হলে একমাত্র ক্লাসিক সাহিত্যের কথাই বলা চলে।

একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করেছিলাম। সাহেবপাড়ায় বড়ো মেয়ের বাড়িতে শম্পার মা মাঝে মাঝে যেতেন, দিদির বাড়িতে শম্পার নিয়মিত যাতায়াত ছিল, কিন্তু বোসসাহেবকে বা বোসসাহেবের মেমসাহেবকে কোনোদিন এই 'বি'-টাইপ বাড়িতে আসতে দেখিনি।

শম্পাদের বাড়ির সঙ্গে পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হবার পরে আমি একদিন কথায় কথায় এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, আমি বারণ করেছি। সেদিন আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি। অনেক দিন পরে শম্পার মুখে শুনেছি, শম্পার মা জিনিসটাকে অপছন্দ করতেন দুই কারণে। অত বড়ো একজন অফিসার সামান্য একজন কর্মচারীর বাড়িতে যাতায়াত করলে অফিসারের সম্মানহানি এবং যে বাড়িতে তিনি যাতায়াত করছেন সেই বাড়িটির প্রতি পাড়ার লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হবার সম্ভাবনা। সেদিন মনে হয়েছিল, শম্পার মা-র বাড়াবাড়ি কিন্তু এখন ওঁর দূরদর্শিতার কথা ভেবে অবাক হই।

শম্পাকে কোনো দিন বোসসাহেবের ল্যাণ্ডরোভারে উঠতে দেখিনি। বহুদিন এমন হয়েছে বোসসাহেব লাঞ্চ খাবার জন্যে বাড়ি ফিরছেন আর শম্পারও ঠিক

সেই সময় ডিউটি শেষ হয়েছে। বোসসাহেবের বাড়ি যাবার পথেই শম্পাদের বাড়ি, তবুও শম্পা সেই প্রচণ্ড রোদে হেঁটে বাড়ি গেছে।

এসব ঘটনা উল্লেখ করছি শুধু এটুকু বলবার জন্যে যে এখানে অফিসিয়াল সম্পর্কের চৌহদ্দির মধ্যেই সকলের যাতায়াত, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বড়ো একটা নেই।

একটি ছোট ঘটনা বলি।

আমি দুপুরবেলা স্নান করবার জন্যে বাড়ি ফিরি। তারপর আবার আপিস যাবার পথে হোটেলে খেয়ে নিই। একদিন সবেমাত্র স্নান করে উঠেছি, এমন সময় টেলিফোনে এ-পি-ওর জরুরী ডাক : আপনি এক্ষুনি আমার সঙ্গে আপিসে দেখা করুন।

অফিসারের ডাক, যেতেই হবে। অভুক্ত অবস্থাতেই দেখা করলাম এ-পি-ওর সঙ্গে। এ-পি-ও মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্সোনেল অফিসার। এস্টাব্লিশ্‌মেন্টের বড়োকর্তা, চাকরির ভালো-মন্দ এই ভদ্রলোকের মর্জির ওপরেই নির্ভর করে।

এ-পি-ও বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার একজন অপারেটরকে বাধ্য হয়ে সিরিয়াস প্যানিশ্‌মেন্ট দিতে হবে।

তারপর তিনি ধীরেসুস্থে হঠাৎ এই মারমুখী মূর্তি ধারণ করার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। তিনি ওয়েল্‌ফেআর অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলেন, পর পর তিনবার কানেক্‌শন্ নিয়েছেন তিনবারই মাঝপথে লাইন কেটে গেছে। এবং তাঁর স্থির ধারণা, এজন্যে অপারেটর দায়ী।

তারপর এক টুকরো কাগজ আর পেনসিল নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন বোর্ডে যে অপারেটর আছে তার নাম কি?

আমি বললাম, মিস শম্পা মিত্র।

ঘস্‌ঘস্ করে তিনি নামটা লিখে নিলেন। এমন একটা ভঙ্গি যেন ছয় নম্বর আইটেম চিহ্নিত চার্জশীটের জবাবের চূড়ান্ত রায় দেওয়া হচ্ছে।

তারপর কাগজটাকে চোখের সামনে ধরে দেড় চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে

হঠাৎ কি মনে পড়তেই চোখদুটো বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বোসসাহেবের শালী না ?

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

তিনি বললেন, আচ্ছা, আপনি যান।

তারপর আমার চোখের সামনেই কাগজটা টুকরো টুকরো করে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

টাইপ-বিভক্ত এই শহরে নিজস্ব কোনো কালচার গড়ে ওঠেনি। বা গড়ে ওঠার সুযোগ নেই। কালচার সৃষ্টির গোড়ার কথা হচ্ছে মেলামেশা—এবং এখানে এই জিনিসটি নেই বললেই চলে। অথচ মেলামেশা করার সুযোগ ও সুবিধে এখানে যতোটা আছে এমন আর কোথাও নেই। এখানে আপিসের ভেতরে ও আপিসের বাইরে একই লোকের সঙ্গে দেখাশোনা ও কথাবার্তা। সুতরাং অফিসিয়াল সম্পর্ক ছাড়াও মনের সম্পর্ক খুব সহজেই গড়ে উঠতে পাবে।

কিন্তু যা গড়ে ওঠে তা ঠিক এর উলটো। অফিসিয়াল সম্পর্কের সীমানা অতিক্রম করতে গেলেই নানা রকম বাধানিষেধের সম্মুখীন হতে হয়। আমার মনে আছে, একদিন বোসসাহেব আমাকে খাস কামরায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আপনি স্টাফ্‌কে একটু ডাঁটাতে পারেন না ?

কথাটা বুঝতে না পেরে বললাম, আজ্ঞে !

তিনি বুঝিয়ে বললেন। প্রত্যেককে পালা করে ধমক আর দাব্‌ড়ানি দিতে হবে। ইংরেজীতে যাকে বলে, চেএজ্‌ করা। এরই নাম ডাঁটানো। বলে এমন একটা মুখের ভাব করলেন যেন একটা রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। শেষকালে মন্তব্য করলেন, আপনার একটা মারাত্মক দোষ কি জানেন। স্টাফের সঙ্গে বড়ো বেশি মেলামেশা করেন আপনি। অর্থাৎ ধমক এবং দাব্‌ড়ানি না দিতে পারলেই সেটা হয় 'বড়ো বেশি মেলামেশা করা' আর তা একটা 'মারাত্মক দোষ'।

অন্যরা আগে থেকেই সাবধান হয়। মেলামেশা করা দূরের কথা, কোনো রকম সামাজিক সম্পর্ক পর্যন্ত কেউ রাখে না। চাকরি আর বাড়ি। কলম পেশা আর নিঃসঙ্গ প্রহর গোনা। এখানে বাস করতে হলে অস্পৃহসঙ্গ হতে হবে। শহরে দুটি মাত্র বাস চলে। তাও ধরাবাঁধা রুটে এবং নির্দিষ্ট সময়ে। আপিস-টাইমের বাইরে বাস চলাচল একরকম বন্ধ বললেই হয়। তখন যাতায়াতের বাহন সাইকেল অথবা সাইকেল-রিক্‌সা। রাত দশটার পরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সিকিউরিটি পুলিশ চ্যালেঞ্জ করে—সঙ্গে পরিচয়পত্র না থাকলে হয়রানির একশেষ। সুতরাং আপিস থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর অত্যন্ত উৎসাহী না হলে কেউ এক পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় যায় না। আর এই অত্যন্ত উৎসাহীদেরও যাতায়াত বড়ো জোর বাবুপাড়া, কেরানিপাড়া ও কারিগরপাড়ার মধ্যে। মজদুরপাড়া অচ্ছুতের মতো একান্তে অপাঙক্তেয় হয়ে থাকে। আর মজদুরপাড়া থেকে যে কোনো পাড়াতেই আসতে হোক না কেন মাঝে যে লম্বা রাস্তাটি পার হতে হয় সেখানে রাত্রিবেলা আলো জ্বলে না। সুতরাং পাঁচটার সময়ে কারখানার ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার রাস্তায় যেটুকু প্রাণচাঞ্চল্য জাগে তারপরে আর কিছু নেই।

সপ্তাহের অন্যান্য দিনে তো নয়ই, এমন কি শনিবার সন্ধ্যাতেও নয়।

প্রতিদিনের মতো এই দিনেও সন্ধ্যা হতে না হতেই সারা শহর কেমন যেন নিঃঝুম হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ ডাক আর অনেকক্ষণ পরে পরে দু-একজনের যাতায়াত। মার্কেটের স্টলগুলো আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে, কফি হাউসের সবুজ আলো অনেক দূর থেকে দেখা যায়, লাইব্রেরির রীডিং-রুমে ফ্লুয়োরেসেন্ট টিউবের তলায় সারি সারি টেবিল পাত—কিন্তু কোথাও যেন প্রাণের চিহ্ন নেই। মনে হয়, দূর সমুদ্রযাত্রার জন্যে যে বাষ্পীয়পোতকে নানা সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল তা যাত্রার শুরুতেই অদৃশ্য চড়ায় ঠেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ভরাডুবি হচ্ছে।

একজন স্কুলমাস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। থাকেন বাবুপাড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে। শান্ত, নির্বিরোধী মানুষ। আর গানবাজনার ভয়ানক শখ। গান-বাজনা একা ঠিক জমে না। তিনি চেষ্টা করেছিলেন চেনা-পরিচিত আরো কয়েকজনকে নিয়ে একটা কনসার্ট পার্টির মতো গড়ে তুলতে। এই কনসার্ট পার্টির প্রথম অধিবেশনেই একজন প্রস্তাব করলেন, ডি-জি-এমকে প্রেসিডেণ্ট করে একটা কমিটি গঠন করা হোক্।

ডি-জি-এম মানে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। তিনি এই শহরের সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট। কোনো সরকারী বাধ্যবাধকতা আছে তা নয়। কিন্তু দেখা গেছে, যেখানেই ডি-জি-এম নেই সেখানেই অযাচিতভাবে এসে দাঁড়ান সিকিউরিটি অফিসার। ডি-জি-এম-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠান তবু টিকে থাকে কিন্তু সিকিউরিটি অফিসারের নজর পড়লেই সর্বনাশ। গণেশের ধড়ে হাতীর মুণ্ড চাপিয়েও তখন আর পার পাওয়া যায় না।

ঢাক-পেটানো-গাছের কিছু একটা ব্যাপার করার ইচ্ছে ভদ্রলোকের ছিল না, সুতরাং প্রথম অধিবেশনেই অন্তিম অধিবেশন করে তিনি গানবাজনার শখের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

টেলিফোনের কয়েকজন ছেলেমেয়ে 'চেনা-জানার আসর' নামে একটি বৈঠকে মেলামেশা করত। কিছু গান, কিছু আবৃত্তি আর গল্পগুজব—এই ছিল বৈঠকের সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম। বাইরের লোক কেউ আসত না, বাইরের লোক কেউ জানতও না। কিন্তু এখানে যে-ঘটনা কাকপক্ষীও টের পায় না তা টের পান সিকিউরিটি অফিসার। শেষকালে তিনি এমন একটা কায়দায় খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন যে আসরের সভ্যরা আতঙ্কিত হয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিল।

'চেনা-জানার আসর'-এর উদ্যোক্তা ছিল শম্পা। বি এস-সি ক্লাসের ল্যাবরেটরি থেকে পা বাড়িয়েই টেলিফোনের সুইচবোর্ড-রুমে পৌঁছতে ওর যেমন বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তেমনি হয়তো ভেবেছিল, কলেজ-জীবনের হাওয়াকেও এক্সচেঞ্জের গুমোট ঘরে অনায়াসে সঞ্চারিত করা যায়। প্রথম দিনের অধি-

বেশনে ও গান গেয়েছিল—নাই, নাই ভয়! কিন্তু ভয় যে এখানে জলজ্যান্ত মানুষের রূপ নিয়ে সিকিউরিটি অফিসার হয়ে আছে, সে-ধারণা ওর ছিল না।

অফিসারদের তৃতীয় নয়নের কথা আগেই বলেছি। এবারে তার আরো একটা প্রমাণ পেলাম। তখনো 'চেনা-জানার আসর' বাস্তব রূপ নেয়নি, শম্পা সবে-মাত্র দু-একজনের সঙ্গে আলাপ করেছে। হঠাৎ বোসসাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে প্রচণ্ড এক হুংকার ছাড়লেন, ডিসিপ্লিন বলে একটা জিনিস আছে তা কি আপনি জানেন না?

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম। তিনি আবার বললেন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আড্ডাখানা নয়, এটা সবাইকে বলে দেবেন।

দিন দুয়েক পরে অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেটিভ বিল্‌ডিং-এর পেছনে চায়ের দোকানে আমার লাইনম্যানের সঙ্গে একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে চা খাচ্ছি হঠাৎ বোসসাহেব ল্যাণ্ডরোভারে যেতে যেতে প্রচণ্ড ব্রেক কষলেন এবং ইলেকট্রিক হর্ন টিপে ডাক-লেন আমাকে। সামনে যেতেই বললেন, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এই অবস্থায় আর যেন কোনো দিন আর না দেখি। চেনা-জানা করতে হয় ঘরে বসে করবেন।

অর্থাৎ, এখানে প্রত্যেকের চলাফেরার যে গণ্ডিবদ্ধ সীমানা আছে তা কিছুতেই অতিক্রম করা চলবে না।

এমনকি, ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই বিষাক্ত আবহাওয়া সঞ্চারিত হয়েছে। বাংলো ও 'ডি' টাইপের ছেলেমেয়েরা নিচু টাইপের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসে না। স্কুলের সর্ব ব্যাপারে উচ্চতর টাইপের ছেলেমেয়েদের বিশেষ খাতির। 'বি' টাইপ মাস্টারদের এমন সাহস নেই যে বাংলো ও 'ডি' টাইপ ছেলেমেয়ের কোনো রকম শাস্তি দেয়। পরীক্ষায় এরা সবচেয়ে বেশি নম্বর পায়, ইস্কুলের প্রাইজগুলো প্রতি বছর এদের বাঁধা বরাদ্দ। প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে এসব ছেলেমেয়ে এতদূর দুর্বিনীত হয়েছে যে মাঝে মাঝে শিক্ষকদের ওপর হুকুম চালাতেও দ্বিধা করে না।

এই টাইপ-বিভক্ত শহরে কোনো মানুষের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। কে কোন্ টাইপের কোয়ার্টারে বাস করে তার ওপরেনির্ভর করে কতখানি তার চলাফেরার স্বাধীনতা, কতখানি সে মেলামেশা করতে পারে, কতদূর তার কথা গ্রাহ্য হবে। এমনকি মনে হয়, বিভিন্ন কোয়ার্টারের অবস্থান নির্ধারণ করবার সময়েও এই কথাটি মনে রাখা হয়েছে। বাংলোতে যাঁরা বাস করেন তাঁদের আত্মস্বাতন্ত্র্যে যেন কোনো দূষিত ছোঁয়াচ না লাগে সেজন্যে সতর্ক পরিকল্পনা। বাংলোর আশে-পাশে অন্য কোনো টাইপের কোয়ার্টার নেই। 'ডি' টাইপ কোয়ার্টারের মধ্যে যে-সব কোয়ার্টারে জুনিয়ার অফিসাররা থাকে তার সান্নিধ্য নিষ্কলুষ রাখা হয়েছে, কিছু কিছু 'ডি' টাইপের উল্টো দিকে 'সি' টাইপ আছে, যেমন আছে কিছু 'সি' টাইপের উল্টো দিকে 'বি' টাইপ। কিন্তু 'এ' টাইপ একেবারে অপাংক্তেয়, নগরীর একেবারে বহিঃসীমায় অত্যন্ত সংকীর্ণ একটা পরিধিতে সীমাবদ্ধ। আশে-পাশে 'বি' টাইপ পর্যন্ত নেই। এইখানেই শেষ নয়। জীবনযাত্রার পদ্ধতি পর্যন্ত পূর্ব-নির্ধারিত। 'বি' টাইপের বাসিন্দা হলে বরাদ্দ চারটি মাত্র ইলেকট্রিক বাতির পয়েন্ট আর পঁচিশ ওআটের চারটি বাতি। সন্ধ্যার পরে কলতলায় বা অন্যত্র যত জরুরী প্রয়োজনই হোক না কেন সেজন্যে আলোর ব্যবস্থা নেই। বি-টাইপ মানুষের রেডিও থাকতে পারে কিন্তু 'বি' টাইপ কোয়ার্টারে রেডিও চালাবার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত। গরমের সময়ে ইলেকট্রিক পাখাও চালাতে পারে না। হীটার নয়, ইস্ত্রি নয়। শুধু চারটি পয়েন্ট আর পঁচিশ ওআটের বাতি—পয়সা খরচ করলেও এ-ছাড়া অন্য কিছু পাবার উপায় নেই। এই হচ্ছে 'বি' টাইপ।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা বি-টাইপ তাদের দেখলে অবস্থার মর্মান্তিকতা কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। পঁচিশ ওআটের বাতিতে ছাপার অক্ষর স্পষ্ট দেখা যায় না। সমস্ত দৃষ্টিশক্তিকে একেকটি অক্ষরের ওপরে কেন্দ্রীভূত করে পড়বার অমানুষিক চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে ওঠে। দেখে-শুনে মনে হয়, বি-টাইপে যারা থাকে তাদের ছেলেমেয়েরা যে আবার লেখাপড়া

করবে এ-ধারণা কর্তৃপক্ষের নেই। দরখাস্ত করলেও বি-টাইপের অন্তত একটি ঘরে উচ্চতর ওআটের বাতি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয় না।

রাত জেগে পড়াশোনার সুবিধের জন্য শম্পা কলকাতা থেকে একটা টেবিল ল্যাম্প এনেছিল। বাতিটা ও আর কোনো দিন জ্বালাবার সুযোগ পায়নি। একদিন সন্ধ্যার পরে শম্পাদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, শম্পা পড়ার টেবিলের সামনে দু-হাতে মাথা গুঁজে রয়েছে। সামনে বই আর খাতা খোলা। বুঝলাম, অল্প আলোয় পড়বার চেষ্টা করে চোখ টাটিয়ে উঠে মাথা ধরেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমারও চোখদুটো জ্বালা করে উঠল। রাস্তায় দিনের মতো আলো, ফ্লুয়োরেসেণ্ট টিউব আর সার্চপোস্টের ছড়াছড়ি, আর 'বি'-টাইপ কোয়ার্টারে আর একটু বেশি আলোর ব্যবস্থা করলে কী এমন ক্ষতি হত?

শম্পা যখন প্রথম এসেছিল তখন ওর চোখের পাওয়ার ছিল মাইনাস্ টু, এক মাস বাদেই চশমা পাল্টাতে হল। মাইনাস্ ফোর! আমাকে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, এভাবে চললে আমাকে আর পরীক্ষা দিতে হবে না, তার আগেই অন্ধ হয়ে যাব।

অন্ধ অংশ্য ও হয়নি। কিন্তু যা হতে হয়েছিল তার চেয়ে অন্ধ হওয়াও বোধ হয় ভালো ছিল। সেই ঘটনা পরে বলছি।

শুধু ঘরের ইলেক্‌ট্রিক বাতি নয়, বাইরের নানা ব্যাপারেও প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে কে কোন্ টাইপ থেকে এসেছে। হাসপাতালে এক-এক টাইপের জন্যে এক এক রকম ব্যবস্থা। টাইপ হিসেবে হাসপাতালের ওষুধে ও চিকিৎসায় পর্যন্ত তারতম্য ঘটে। কো-অপারেটিভ স্টোর্সে রেশন ও কাপড়ের জন্যে 'এ' ও 'বি' টাইপকে লম্বা লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, বাংলো ও 'ডি' টাইপের জন্যে অবারিতদ্বার খিড়কি। নাচগানের বিশেষ অনুষ্ঠানে বাংলো ও 'ডি' টাইপের টিকিট বিক্রি হবার পর উদ্বৃত্ত অংশ 'বি' ও 'এ' টাইপে বিক্রি হয়। পূজামণ্ডপে সামনের সারি ও পেছনের সারির মধ্যেও এই ধরনের ভাগা-ভাগি।

সমগ্র শহর স্তরে স্তরে ভাগ হয়ে গেছে। কি আপিসে কি আপিসের বাইরে। চিঠিতে ঠিকানা লেখার সময়েও অনাবশ্যকভাবে কোয়ার্টারের টাইপ উল্লেখ করা হয়। মানুষগুলোর চালচলন হাবভাব কথাবার্তায় পর্যন্ত অজ্ঞাতসারে এমন কতকগুলো ভঙ্গি এসে গেছে যে কে কোন্ টাইপের বাসিন্দা তা বুঝে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এখানে মানুষ থাকে না, থাকে কতকগুলো টাইপ। বাংলো-ডি-সি-বি-এ।

সুরকির যাঁতাকলে নানা আকারের ও নানা রঙের ইঁট একসঙ্গে মিশে গুঁড়িয়ে যায়। তারপর আর তাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। এখানেও এমনি এক প্রকাণ্ড যাঁতাকল। মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গুঁড়িয়ে মিলিয়ে কতকগুলো টাইপ তৈরি হচ্ছে।

কোনো এক গভর্নর-পত্নী এখানকার কোনো এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গণ-সংযোগের কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ, ছোটর সঙ্গে বড়োর, নিচুর সঙ্গে উঁচুর অবাধ মেলামেশা। এই গণসংযোগের ঠেলা কিছু দিন ধরে সাধারণ কর্মচারীদের সামলাতে হয়েছিল। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ ল্যাণ্ডরোভার থামিয়ে বড়ো বড়ো অফিসাররা হুড়মুড় করে কোয়ার্টারের মধ্যে ঢুকে পড়তেন। গৃহস্থ তো তটস্থ। কোথায় বসাবে! কী কথা বলবে! গণসংযোগ করে বেরিয়ে যাবার পরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত সবাই।

কারিগরপাড়ার এক 'বি' টাইপ কোয়ার্টারে গণসংযোগ করতে এসেছিলেন মস্ত এক অফিসারের পত্নী। কোয়ার্টারে ঢুকে তিনি দেখলেন, বছর আটেক বয়সের একটি ছেলে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

ও কাঁদছে কেন ভাই? অফিসার-পত্নীর প্রশ্ন।

'বি'-টাইপবাসিনী তাকিয়ে দেখলেন, শাড়িতে-গয়নায় জীবন্ত ঘোষণা হয়ে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। ইনি কোনো অফিসার-পত্নী হতে পারেন সে-ধারণা না করেই তিনি জবাব দিলেন, কাঁদছে আমার হাড় জ্বালাবার জন্যে! ওদের কান্নার জন্যে কোনো কারণ দরকার হয় নাকি?

অফিসার-পত্নী তো থ। ইতিপূর্বে যতো জায়গায় তিনি গেছেন সবাই খাতির করে বসিয়েছে, হাঁ করে মুখের কথা শুনেছে, একটি কথা না বলতেই দশজনে জবাব দেবার জন্যে ছুটে এসেছে। কিন্তু এ-ধরনের জবাব শুনতে তিনি অভ্যস্ত নন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষকালে আমতা আমতা করে বললেন, ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার।

কাকে? 'বি'-টাইপবাসিনী বুঝতে না পে.র প্রশ্ন করলেন।

এই ছেলেটি। ওর নিশ্চয়ই অসুখ করেছে তাই এত কান্না। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, আপনি বলেন তো আমি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। বলেই অফিসার-পত্নী ছেলেটিকে ধরবার জন্যে দু-পা এগিয়ে এলেন।

চকিতে 'বি'-টাইপবাসিনী ঘুরে দাঁড়ালেন। ছেলেটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে দু-চোখে আগুন ঝরিয়ে বললে, খবরদার বলছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবেন না!

সে কি? আপনার ছেলেকে আমি মারছি না ধরছি? অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে শান্ত গলায় অফিসার-পত্নী বললেন।

'বি'-টাইপবাসিনী জবাব দিলেন, থাক্, ওসব কথা আমি অনেক শুনেছি। ছেলধরাদের চিনতে আমার আর বাকি নেই।

ঠিক এমনি আরেক ধরনের গণসংযোগের ঠেলা দু-একদিন সহ্য করতে হয়েছিল আশেপাশের সাঁওতাল-বসতির লোকজনকে। কোনো গভর্নর কিংবা গভর্নর-পত্নীর বক্তৃতার ফল কিনা কে জানে, 'নো ইওর নেবার' নামে একটি সংগঠন হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রতিবেশীকে চিনতে হবে। প্রথামতো ডি-জি-এম এই সংগঠনের সভাপতি আর প্রচার-দপ্তরের একজন কর্মচারী হচ্ছেন সম্পাদক। রাইফেলধারী সিকিউরিটি পুলিস নিয়ে এই সংগঠনের পাণ্ডারা ল্যাণ্ডরোভারে চেপে যখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে যেতেন তখন প্রতি-বেশীদের অবস্থা যে কী হত তা সহজেই অনুমেয়। এই সংগঠনের দ্বিতীয় অভিযানে কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক মন্ত্রী সঙ্গী হয়েছিলেন। এক সাঁওতাল

বুটিয়ের দাওয়ায় খাটিয়ার ওপর বসা অবস্থায় রাইফেলধারী পুলিস সমেত তাঁর একটা ফটো তোলা হয়। ফটোর একপাশে সাঁওতাল মূর্তিও ছিল জনকয়েক। সেই অস্পষ্ট ছবিতেও সাঁওতালদের মুখেচোখে যে-ভাব ফুটে উঠেছিল তা যদি আত্মীয়তা স্থাপনের ফলে হয়ে থাকে তবে বাঘে তাড়া করলে মুখচোখের চেহারা কী হবে তা গবেষণসাপেক্ষ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী একবার এখানে পদার্পণ করেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্মৃতিতে এই ঘটনা এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে—তাঁর বিপুলধী বক্তৃতার জন্যে নয়, তাঁর চব্বিশ ঘণ্টার স্থিতির নিরাপত্তার জন্যে সাত দিন ধরে যে বিরাট সামরিক পুলিস ও গোয়েন্দাবাহিনীর সমাবেশ ঘটেছিল সেজন্যে। সারা পশ্চিমবাংলার পাঁচজন এস্-পির মধ্যে চারজনেরই আবির্ভাব, আড়াইশো এস-আই, পাঁচশো হাবিলদার এবং হাজার দুয়েক রাইফেলধারী পুলিস। এছাড়া ছিল এখানকার নিজস্ব সিকিউরিটি বাহিনী। গোয়েন্দাদের সংখ্যা কত ছিল তার কোনো হিসেব নেই। অ্যাপ্রেন্‌টিস্ হোস্টেলের পুরো একটি ব্লক ছেড়ে দিয়েও এই বিরাট বাহিনীর একাংশেরও স্থানসংকুলান হয়নি। রাবণের চিতার মতো সারি সারি উনুন জ্বালিয়ে যে বিরাট ভোজ্যবস্তুর আয়োজন করা হয়েছিল তাতে রূপনারায়ণ-পুর উদ্বাস্তু শিবিরকে দু-মাস বসিয়ে খাওয়ানো যেত। প্রধানমন্ত্রী এখানে আসছেন এ-সংবাদ অনেকের জানা ছিল। কিন্তু এই বিরাট সামরিক ও পুলিসবাহিনীর আয়োজন কি জন্যে, সেটা অনেকেই জানত না। প্রধানমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন এই নগরীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে। এবং এই আত্মীয়তাস্থাপনের ঠেলায় এখানকার বাসিন্দারা সাত দিন তটস্থ অবস্থায় দিন কাটিয়েছে। আশে-পাশে সাঁওতালদের কপাল ভালো যে দুটিমাত্র অভিযানের পরেই 'নো ইওর নেবার' সংগঠনের অকালমৃত্যু হয়েছে। নইলে তাদের হয়তো দ্বিতীয়বার ভিটেমাটি ছাড়তে হত।

মহিলাদের একটি সংগঠন আছে, তার নাম মহিলা-সমিতি। এক জাঁদরেল অফিসারের স্ত্রী এই সমিতি পরিচালনা করেন। সমিতির উদ্দেশ্য, মেয়েদের

সংগঠিত করা ও নানা বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা। মাঝে মাঝে বৈঠক হয়। অফিসারদের বৌরা এসব বৈঠকে ভিড় করে আসেন। এঁদের উৎসাহ দেখলে অবাক হতে হয়। যাঁরা কোনো দিন রান্নাঘরের চৌকাট মাড়ান না তাঁরাই প্রথম সারিতে আসন নিয়ে অনন্যমনা হয়ে শোনেন, কাঁচকলার খোসার শিককাবাব কি ভাবে তৈরি করতে হয় আর তা কী উপাদেয় খাদ্য। টুকরো টুকরো ছাঁটকাপড় জোড়া দিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্যে কি সুন্দর জামা তৈরি করা যেতে পারে—এই বিষয়েও এঁদের অনাহৃত একাগ্রতা। উল ও খোঁপার প্যাটার্ন, ছুঁচের কাজ ও আলপনার ডিজাইন, রবীন্দ্রসংগীতের ধ্বনিবিন্যাস ও তাঁত চালাবার কৌশল—কোনো বিষয়েই এঁদের আগ্রহের অভাব নেই। বৈঠকের শেষে বাড়ি ফিরেও এঁরা মহিলা-সমিতির কথা ভুলে যান না; তলিয়েবিচার করেন কোন্ অফিসারের স্ত্রীর গায়ে কি কি নতুন শাড়ি-গয়না দেখা গেছে। তারপর নতুন উৎসাহে পরের বৈঠকের প্রস্তুতি চলে। প্রস্তুতি চলে সবার ওপরে টেক্কা দেবার, সবাইকে চমৎকৃত করার। এই নিঃশব্দ অনুচ্চারিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা মহিলা-সমিতির ভিত্তি-মূলে থেকে এক বৈঠক থেকে আরেক বৈঠকে উত্তীর্ণ হবার পথ সুগম করে রেখেছে।

'এ' টাইপের মহিলারা এই সমিতিতে বিশেষ পাত্তা পান না, 'বি'টাইপকে কোনো রকমে বরদাস্ত করা হয়। 'বি' ও 'সি' টাইপের যে-সমস্ত মহিলা সমিতিতে ভিড় করেন তাঁরা কতকটা যান বাংলো ও 'ডি' টাইপের শাড়ি-গয়না তারিফ করতে, কতকটা সময় কাটাতে এবং পরনিন্দা ও পরচর্চা করতে। মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, বাংলো ও 'ডি' টাইপের মেয়েরা বিশেষ করে অংশগ্রহণ করে। প্রচার-দপ্তরের সরকারী ফটোগ্রাফার ছবি তোলে।

একদিন শম্পার বাড়িতে গিয়েছি, দেখলাম বাবুপাড়া থেকে ছোট্ট একটি মেয়ে বেড়াতে এসেছে। শম্পার মাকে ও বললে, মাসীমা, আমাকে একটা সবুজপেড়ে লাল শাড়ি দিতে হবে।

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, কেন রে?

মহিলা-সমিতির অনুষ্ঠান আছে, আমি নাচব।

আমাদের একটু নাচ দেখাবি না?

মেয়েটি নাচ দেখাল। ফাগুন লেগেছে বনে বনে—ঝুমুর নেই, সঙ্গত নেই, তবুও যেন মনে হল শীতশীর্ণা অরণ্যানী ফাল্গুনের স্পর্শে নব কিশলয়ে জেগে উঠছে। সত্যিই ভালো নাচে মেয়েটি। কিন্তু শেষপর্যন্ত মহিলা-সমিতির অনুষ্ঠানে এই মেয়েটির নাচ আর হয়নি। লাল শাড়ি পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু সবুজ পাড়ওলা শাড়ি একটিও ছিল না এবং সবুজ পাড়ওলা লাল শাড়ি না হলে নাকি মহিলা-সমিতির অনুষ্ঠানে এই নাচটি নাচা চলবে না। এদিকে অনুষ্ঠানের জন্যে পর পর ট্রাঙ্ককল হচ্ছে, গ্যালন গ্যালন তেল পুড়লেও ক্ষতি নেই, কলকাতায় ছোটাছুটিও কম হয় না—কিন্তু একটি সবুজপেড়ে লাল শাড়ি কেনা চলে না।

সেই মেয়েটি বললে, আমরা 'বি' টাইপ কিনা তাই আমাদের জন্যে কারও গা নেই।

অবশ্য গা করার অসুবিধেও আছে। ট্রাঙ্ককল, মোটরের তেল বা কলকাতায় যাতায়াতের খরচ মহিলা-সমিতিকে দিতে হয় না, গৌরী সেনের হিসেবে নয়ে-ছয়ে মিশে যায়। সেখানে সবুজপেড়ে লাল শাড়ি হয়তো বড়ো বেশি বেমানান।

টেলিফোন একস্‌চেঞ্জে সুমিতা চ্যাটার্জি নামে একটি মেয়ে মাত্র একটিবারের জন্যে মহিলা-সমিতির এক বৈঠকে গিয়েছিল। তারপর আর যায়নি। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি মহিলা-সমিতিতে যান না কেন?

নিরাভরণ হাত দুখানি চোখের সামনে তুলে ধরে সুমিতা বললে, আমার লজ্জা করে।

ওর হাতে যে কোনো খুঁত আছে তা নয়। মর্মরমসৃণ নিটোল হাত। লজ্জা সেজন্যে নয়, লজ্জা হাতভরা চুড়ি নেই বলে।

বিয়ের পর ওর দু-হাত ভর্তি চুড়ি হল। তখন ওকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি মহিলা-সমিতিতে যান না কেন?

সেই দুটি হাত চোখের সামনে তুলে ধরে ও আবার বললে, আমার লজ্জা করে। মর্মরমসৃণ নিটোল হাত, লজ্জা সেজন্যে নয়। দু-হাত ভর্তি গয়না, লজ্জা সেজন্যেও নয়। বনেদী আমলের শ্বশুরবাড়ি থেকে যে-সব গয়না দিয়েছে তার প্যাটার্ন এত পুরনো যে হালফিল রুচিতে তা অচল—লজ্জা সেজন্যে।

'এ' টাইপের একটি মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি মহিলা সমিতিতে যান না কেন?

সিটা কুন্‌ঠে গো?

তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। খুব মনোযোগের সঙ্গে আগাগোড়া সমস্তটা শুনে তিনি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন, উ ময়লা সমিতিতে যাবনি।

'হ' বলতে পারেন না, বলেন 'য়'।

কারখানার উঁচু ক্লক-টাওয়ারে দাঁড়িয়ে যদি প্রোজেক্টের দিকে তাকানো যায় তবে দক্ষিণে কারিগরপাড়া ও উত্তরে মজদুরপাড়া। পুবে চওড়া একটা রাস্তা, তারপর পোড়ো জমি, বনজঙ্গল, তারও পরে অজয় নদী। পশ্চিমেও প্রথমে রাস্তা, তারপর পোড়ো জমি, তারপরে বাঁয়ে কেরানিপাড়া, ডাইনে বাবুপাড়া, এবং পেছনদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাহেবপাড়া। কেরানিপাড়া ও সাহেব-পাড়ার মাঝখানে সবুজ পাহাড় এবং কেরানিপাড়া ও কারিগরপাড়ার মাঝখানে হাসপাতাল। সাহেবপাড়া থেকে কারখানা, কারিগরপাড়া থেকে মজদুরপাড়া—সমগ্র অঞ্চল সংরক্ষিত এলাকা। তিনটি ব্যারিয়ার গেট আছে। সাহেব-পাড়ায় ঢুকতেই এক নম্বর ব্যারিয়ার গেট, কেরানিপাড়ায় দু নম্বর, কারিগর-পাড়ায় তিন নম্বর। অর্থাৎ তিনটি ব্যারিয়ার গেটই রেললাইনের দিকে। এই সংরক্ষিত এলাকার মধ্যেও আবার কতকগুলো স্থান বিশেষভাবে সংরক্ষিত। আইডেন্‌টিটি কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাই বিশেষ পারমিটের ব্যবস্থা। এই প্রোজেক্টের গোড়াপত্তন থেকে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে আজো এমন অনেকে আছেন

যাঁরা কারখানা-এলাকা দেখেননি।

মাঝে একবার জেনারেল ম্যানেজার অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে সার্কুলার মারফত ঘোষণা করেছিলেন যে যে-সব কর্মচারী কারখানা দেখতে চান তাঁরা জেনারেল ম্যানেজারের কাছে নাম পাঠালে কারখানা দেখাবার ব্যবস্থা করা হবে। অনেকেই নাম পাঠিয়েছিলেন। সেই সব নাম জি-এম আপিসের ফাইলের অরণ্যে কোথায় চাপা পড়ে আছে তার হদিস এখন আর কেউ দিতে পারবে কিনা সন্দেহ।

অবশ্য ব্যক্তিগত উৎসাহ ও উদ্যোগেরও অভাব আছে। এখানে এমন একটা আবহাওয়া যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। শুধু কোনো রকমে দিন কাটিয়ে যাওয়া, কোনো রকমে প্রাণ ধারণ করা। মনে হয়, যে গাছ উপযুক্ত জল হাওয়ায় ফুলে-ফলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারত তাকে একটা কাঁচের ঘেরাটোপের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে সেই ধোয়ামোছা তকতকে বস্তুটি দেখে সবাই তারিফ করে। কিন্তু সেই ঘেরাটোপের মধ্যে যে একটু একটু করে প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে সেই ট্রাজেডি সহজে চোখে পড়ে না।

এখানকার নাগরিক জীবনে এই রুদ্ধশ্বাস অপমৃত্যুর নানা বিকার সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কয়েকটি ঘটনা বলছি।

সব চেয়ে বড়ো বিকার মেয়েদের নামে কুৎসা-রটনা। কোনো রকম বাছবিচার আছে তা নয়, তবে বিশেষ করে উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারী মেয়েদের নামেই কুৎসা-রটনাটা বেশি। যে-কোনো দিন যে-কোনো ট্রেনে এসে এখানে পদার্পণের দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই শোনা যাবে কোনো-না-কোনো মেয়ের নামে অত্যন্ত মুখরোচক সব গল্প ঝোড়ো হাওয়ার মতো সারা শহর আলোড়িত করে রেখেছে। সুমিতা চ্যাটার্জির কথাই ধরা যাক। প্রায় সাড়ে-পাঁচ ফুট লম্বা তন্বী চেহারা। শাড়ি-গয়নার ঘোষণা নেই কিন্তু একটা ঋজু কমনীয়তা অলংকারের মতো আশ্চর্য এক সৌন্দর্য দান করেছে।

এখানে প্রথম আসার দিনটিতেই ট্রেনের কামরায় আমি একটি মেয়েকে দেখে-

ছিলাম। তিন-চারজন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে হো হো করতে করতে চলেছে। কামরাভর্তি অপরিচিত লোকের মধ্যে বসে কোনো একজন মেয়ের এমন উচ্চকণ্ঠ হাসি আর কথাবার্তা আগে আমি আর কোনোদিন শুনিনি। সহজাত সংস্কার-বশে মেয়েটি সম্পর্কে খুব একটা খারাপ ধারণা করে নিয়েছিলাম।

কিন্তু শিশুর মতো সরল আর নিষ্পাপ মেয়েটির মুখ। বারবার মনে হচ্ছিল, যার মুখখানি এমন সুকুমার তার মনে কি করে পাপ থাকে ?

এই মেয়েটিই সুমিতা চ্যাটার্জি।

পরে সুমিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ আমার হয়েছিল। কিন্তু এখানে এসে তিন রাত্রি না কাটতেই আমি ওর সম্পর্কে অনেক খবর জেনে ফেলি। ও নাকি লাইব্রেরির দোতলার সিঁড়িতে অন্ধকার রাতে আপত্তিজনক অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ও নাকি কলকাতাগামী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় অফিসারের সঙ্গে ঢলাঢলি করে। ও নাকি কোনো রাতেই বাড়ি থাকে না। এমনি আরো অনেক খবর। আর সংবাদদাতারা সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী।

আমার মনে আছে, অনেকদিন পরে একদিন বিকেলবেলা সুমিতার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ওকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার নামে লোকে এত বদনাম করে তার কারণ কি ?

তখন সবুজ পাহাড়ের ঠিক পিছনটিতে সূর্য অস্ত গেছে। সারা আকাশ লাল। সেই লাল আকাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ও আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলুন তো আপনার বিশ্বাস হয় কিনা ?

বললাম, তবে লোকে কেন বলে ?

ও হাসল : লোকে কেন বলে জানেন ? টেলিফোন গার্ল বলতে লোকের যা প্রচলিত ধারণা আছে আমি তা হতে পারিনি বলে। এই যে দেখছেন আমার হাতের ছাতা আর পায়ের স্লিপার—এই দুয়ের ছোঁয়া বহু লোককে পেতে হয়েছে।

মাস তিনেক পরে সুমিতার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পরেও ও এখানেই ছিল।

আগের মতোই ঘোরাঘুরি করেছে, তেমনি হো-হো কথাবার্তা, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে তেমনি মেলামেশা—কিন্তু তারপরে ওর নামে আর কোনো কুৎসা শুনিনি।

আর তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সুমিতা সেদিন সত্যি কথাই বলেছিল।

সুমিতা একা নয়, অনেক মেয়ে সম্পর্কেই এ-ধরনের কথাবার্তা। ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করলে দেখা যাবে যে এসব কুৎসায় কারও যে খুব বেশি বিশ্বাস আছে তা নয়। কিন্তু জোরালো একটা প্রতিবাদ নেই বলে মিথ্যাশ্রয়ী গল্প মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে মস্ত আকার ধারণ করে। আতঙ্কটা এত বেশি যে গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে কেউ কারও বাড়িতে যেতে ভরসা পায় না। আর, যে-বাড়িতে গৃহিণী নেই সে-বাড়িতে অন্য কোনো মেয়ের বেড়াতে আসাটাও গর্হিত অপরাধ। এখানে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে চান এমন লোকের সংখ্যা যথেষ্ট কিন্তু পেয়িং গেস্ট নিতে চান এমন একজনও নেই। কারণ খুবই স্পষ্ট, কুৎসা রটনার ভয়। সমুদ্রের ঢেউ দেখে যেমন আগে থেকে বোঝা যায় না কোন্ ঢেউ বেলাভূমির কতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে, তেমনি এখানকার কোন্ ঘটনার ঢেউ কোথায় গিয়ে ধাক্কা দেবে সে-সম্পর্কে আগে থেকে কোনো ধারণা করে নেওয়া অসম্ভব।

সাধারণ গৃহস্থী মানুষরা তাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, সাবধানে চলাফেরা করে। পারত-পক্ষে পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো সামাজিক সম্পর্ক রাখে না। ট্রেনের কামরায়, হোটেলে বা ধর্মশালায় ক্ষণস্থায়ী দেখাসাক্ষাতের মধ্যে দিয়ে মুসাফিরদের মধ্যেও যেটুকু মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এখানে বছরের পর বছর গায়ে-গা-লাগানো কোয়ার্টারে বাস করার পরেও দুই পরিবারের মধ্যে তা নেই।

সুতরাং আড্ডা বলে কোনো কিছু আজ পর্যন্ত এখানে গড়ে ওঠেনি। চায়ের দোকানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসর বসে না, ফুটবল খেলার মাঠে পর্যন্ত হৈচৈ চিৎকার নেই। কারিগরপাড়ার দুটি ক্যান্টিনে দু-বেলা প্রচুর লোক ভাত খায়, আর কিছু না-হোক্, খারাপ রান্না হওয়ার জন্যেও কোনোদিন তারা দল বেঁধে হুটোপাটি করেনি। কো-অপারেটিভ স্টোর্সে মাঝে মাঝে চাল পাওয়া যায় না, তবুও সবাই মুখ বুজে ফিরে আসে।

নতুন কোনো লোককে যদি চোখ বেঁধে এনে যে-কোনো বাজারের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, বলো তো কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ? এবং সে যদি জবাব দেয়, কবরখানায়, তাহলেও অবাক হবার কিছু নেই। প্রায় কুড়ি ফুট ব্যাসের গোল একটা বাঁধানো চত্বর, তিন দিকে সারি সারি স্টল। এই গোল চত্বরটিতে তরিতরকারি বিক্রি হয়। তিন-চারজন লোক বসে, সবার কাছেই সব রকমের সওদা। কয়েক ফালি কুমড়ো, সিটিয়ে যাওয়া বেগুন, ছোটো-বড়ো মেশানো আলু, এছাড়া আছে শাকসবজি, পেঁয়াজ, আদা, ডিম, দড়িতে ঝোলানো কয়েক ছড়া কলা। অনবরত জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে শাকসবজিকে তাজা রাখবার আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টা দেখে বোঝা যায় যে কেনা-বেচা খুব বেশি হয় না। পাশে প্রকাণ্ড একটা বোর্ডে টাউন-ইঞ্জিনিয়ারের নোটিস—কোন্ জিনিস কি দামে বিক্রি হবে তার একটা লম্বা ফিরিস্তি। দোকানঘরগুলোর মধ্যে দরজির দোকান, বইয়ের দোকান, কফি হাউস, ফটোর দোকান, কো-অপারেটিভ স্টোর্স, চা-খানা, মুদি, স্টেশনারী ও সাইকেল মেরামতী। তালিকা দেখে মনে হয় যেন খুব একটা জমজমাট জায়গা। অনেক মানুষের যাতায়াত, অনেক মানুষের কথাবার্তা। আসলে কিন্তু তা নয়। কবরখানা।

এই উপমা শুনে একজন চায়ের দোকানদার বলেছিল, কলকাতার যে-কোনো শ্মশানে দিনে গড়পড়তা অন্তত পাঁচটি মড়া আসে। মড়া পিছু চার কাপ চা বিক্রি হলেও দিনে কুড়ি কাপ। সত্যিকারের কবরখানা হলে তো ভালো ছিল মশাই। বইয়ের দোকানদারেরও এই একই কথা। সময় কাটাবার জন্যেও কেউ এসে পত্রিকার ছবি উলটেপালটে দেখে না।

জন্মের পরে শিশু যদি ট্যাঁ ট্যাঁ করে না কাঁদে তাহলে বুঝতে হবে যে সেই শিশুর মধ্যে জীবনের স্রোত নেই; অনিবার্য মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। তেমনি নাগরিক জীবনেও কতকগুলো আপাত-অর্থহীন অভিব্যক্তির দিক আছে। সেগুলো না থাকাটা নাগরিক জীবনের মৃত্যুর লক্ষণ। এখানকার নাগরিক জীবনেও এই ভয়ংকর পরিণতির পূর্বাভাস। একটি ঘটনা বলছি।

কলকাতা থেকে এক ভদ্রমহিলা নতুন-চাকরি-পাওয়া ছেলের সংসার গুছিয়ে দেবার জন্যে কিছু দিনের জন্যে এখানে এসেছিলেন। ছেলের চাকরির দৌলতে ভদ্রমহিলার কোয়ার্টারের টাইপ ছিল 'ডি'। কিন্তু তিনি নিজে যে এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন তা নয়। নিজেই বাড়ির কাজকর্ম করতেন, নিজেই বাজার করে আনতেন।

একদিন আপিস থেকে ফিরে ছেলে চুপচাপ শুয়ে আছে, মা এসে বললেন, হ্যাঁ রে, কলকাতায় দেখি তোর কত বন্ধুবান্ধব ছিল, কত লোক ডাকতে আসত। এখানে বুঝি কারো সঙ্গে আলাপ হয়নি! ছেলে বললে, হবে না কেন মা, হয়েছে। মা বললেন, একদিন কয়েকজনকে চা খেতে বল্ না! কী যে তোর স্বভাব হয়েছে, আপিস থেকে ফিরেই চুপচাপ শুয়ে পড়িস। কয়েকজনকে চা খেতে বল্, তবু তো মানুষজনের কথা শোনা যাবে।

ছেলে বললে, আচ্ছা মা বলব।

দিন কয়েক অপেক্ষা করে মা আরেক দিন মনে করিয়ে দিলেন: কি রে কাউকে বলেছিস?

ছেলে বললে, হ্যাঁ মা বলব। একটা লোক খুঁজছি।

কী খুঁজছিস? মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

একজন লোক, কাজকর্ম করবে, ফাইফরমাস খাটবে। নইলে কি করে লোকজনকে চা খেতে বলি বলো তো?

মা চুপ করে রইলেন। বললেন না যে কলকাতায় এত লোকজনকে তিনি চা খাইয়েছেন কিন্তু কটা চাকর ছিল? তিনি নিজেই কি সকলের সামনে চায়ের কাপ এগিয়ে দেননি?

মা-কে চুপ করে থাকতে দেখে ছেলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করল, 'ডি' টাইপ কোয়ার্টার, বোঝো না মা?

যথাসময়ে একজন চাকর পাওয়া গেলএবং যথাসময়ে একদিন ছেলে আপিস থেকে ফিরে জানালে যে পরের শনিবার বিকেলে দুজনকে সে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে।

শনিবার এল। সারা দিন খেটেখুটে মা ভোজ্যবস্তুও বেশ কিছু তৈরি করলেন। মনে মনে ভাবলেন, এই প্রথম দিনেই যা একটু আয়োজন। তারপর তো ছেলের বন্ধুরা যখন-তখন এসে খাবার আবদার করবে। অসময়ে চা করতে হবে কতবার। এই প্রথম দিনেই যা একটু অযাচিত আয়োজন।

ছেলে বার বার জানিয়ে গেল, মা, তুমি কিন্তু চায়ের কাপ নিয়ে বেরিও না। চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।

মা হেসে বললেন, বুঝেছি রে বুঝেছি। আর গেলেই বা কি, তোরই তো বন্ধু—তাদের সামনে আমার আবার লজ্জা কি রে?

ছেলে বললে, না মা, খবরদার বলছি!

নিমন্ত্রিত দুজনে এল দু-সময়ে। প্রথমজন এল চোরের মতো পা টিপে টিপে, এতটুকু শব্দ না করে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে জিজ্ঞেস করলে, ভিতরে আসতে পারি স্যার?

পায়ের ওপর পা তুলে ছেলে বসেছিল চেয়ারে। সেই অবস্থাতেই আড় চোখে তাকাল, তারপর বললে, এস হে এস। এ তো আর আপিস নয়, চলে এস। বলে হা-হা করে হেসে উঠল।

কথাবার্তা হল খুবই কম। চা ও খাবার গলাধঃকরণ করতে করতে ঢোঁক গিলে লোকটি একবার শুধু বলে, স্যার আমার কেসটা যদি রেকমেণ্ড করে দেন···

অন্যমনস্কভাবে ছেলে শুধু বলে, হুঁ।

প্রথমজন চা খেয়ে যাবার অনেক পরে এল দ্বিতীয়জন। ঘটাং করে গেট খোলবার শব্দ হতেই ছেলে ছুটে বেরিয়েছে অভ্যর্থনা জানাতে।

আসুন স্যার, আসুন।

অভ্যাগত ভদ্রলোকটি ঠোঁটের কোণে সিগারেট চেপে ধরে আড় চোখে একবার তাকালেন, তারপর বললেন, হয়েছে হে হয়েছে। এ তো আর আপিস নয়। বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন।

কথাবার্তা হল খুবই কম। চা ও খাবার গলাধঃকরণ করতে করতে ঢোঁক গিলে ছেলে একবার শুধু বলে, স্যার আমার কেসটা···

অন্যমনস্কভাবে অভ্যাগত ভদ্রলোক শুধু বলেন, হুঁ !

এই হচ্ছে এখানকার যে-কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের সত্যিকারের চেহারা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নেই ; আছে সাহেবের সঙ্গে বড়োবাবুর, বড়োবাবুর সঙ্গে কেরানির, কেরানির সঙ্গে চাপরাশির। 'দাদা' নেই, আছে 'স্যার'। 'বাবু' নয়, 'সাহেব'। ঘরে-বাইরে, বাজারে, বৈঠকখানায়, সর্বত্র একই ধরনের আপিসী চালচলন ও কথাবার্তা।

গত কয়েক বছরে এখানে দুটি কি তিনটি বিয়ে হয়েছে। এখানকার ছেলে-মেয়েরা বিয়ে করে না তা নয়। করে, বাইরে থেকে করে আসে। স্থানীয়-ভাবে বিয়ে হয়েছে দুটি কি তিনটি।

নিমন্ত্রিতের তালিকায় প্রথম নাম বসাতে হবে জেনারেল ম্যানেজারের। তারপরে ডি-জি-এম এবং তারপরে একাধিক বড়ো-ও ছোট সাহেব। বড়োবাবু, কেরানি ও চাপরাশিরা শেষ দিকে। বিয়ের আসরে গলবস্ত্র হয়ে তটস্থ থাকতে হবে, বড়ো বড়ো সাহেবরা কখন আসেন। তাদের জন্যে আলাদা করে টেবিল চেয়ারে বিশেষ খানার বন্দোবস্ত করতে হবে। সপ্রতিভ কোনো মেয়েকে তালিম দিতে হবে তাঁদের পরিবেশন করবার জন্যে। তাঁরা যা কিছু উপহার দেবেন তাই নিয়ে গদ্‌গদ হতে হবে। টোপর মাথায় বরকে সুদ্ধ ছুটে এসে হাতজোড় করে বলতে হবে, আসুন স্যার !

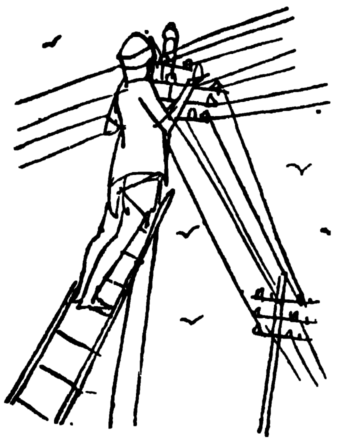
এমনি এক বিয়ের পর দুই বেয়াই-এ কথা হচ্ছিল। একজন বললে, জি-এম সাহেবের মা এসেছিলেন, কিন্তু কিচ্ছু মুখে দিলেন না। অপরজন পকেট থেকে জি-এম সাহেবের নিজের হাতে লেখা অভিনন্দন-পত্র বার করলেন।

কে কাকে টেক্কা দিয়েছে বুঝতে না পেরে দুজনেই চুপ করে রইল।

এক ধরনের পোকা আছে যাদের চোখে দেখা যায় না। অথচ দেখা যায় যে ওই পোকাগুলো বড়ো বড়ো গাছকেও কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। তারপর একদিন সামান্য ঝড়েই প্রকাণ্ড গাছটা মড় মড় করে ভেঙে পড়ে।

এখানকার সমাজ-জীবনের গভীরে এমনি এক অদৃশ্য পোকা অনবরত কুরে কুরে চলেছে।

বিরূপাক্ষ



খালাসী বিরূপাক্ষর বয়স হয়েছে। পঞ্চাশের কাছাকাছি তো হবেই। অল্প অল্প পাক ধরেছে চুলে। কিন্তু তবুও গায়ের চামড়ায় কোথাও একটিও কুঞ্চন-রেখা পড়েনি। শক্ত সমর্থ শরীর। এই সাত বর্গমাইল প্রোজেক্টের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বার চারেক যাতায়াত করতে হয় ওকে। কিন্তু তারপরেও কোনো কাজে উৎসাহের এতটুকু অভাব থাকে না। ঠিক একটা কাঠবেড়ালীর মতো তর-তর করে টেলিফোনের পোস্ট বেয়ে উঠে যেতে পারে। পঞ্চাশ পাউণ্ড রেলপোস্ট বয়ে নিয়ে যাবার সময় এক মাথায় যদি বিরূপাক্ষ থাকে তবে সেদিকে আর দ্বিতীয় কোনো লোকের প্রয়োজন হয় না।

কারিগরপাড়ার একেবারে শেষদিকে বিরূপাক্ষ কোয়ার্টার পেয়েছে। পাশাপাশি দুটি ঘর, আলাদা রান্নার জায়গা, আলাদা কলপায়খানা, এক চিল্‌তে বারান্দা, একটুখানি উঠোন আর সামনের দিকে বাগান করবার জন্যে খানিকটা জায়গা। তিনটে ইলেকট্রিক বাতির পয়েন্ট আছে। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের খালাসীর পক্ষে এমন কোয়ার্টার লোভনীয়। কিন্তু তবুও কোয়ার্টার নিতে চায়নি বিরূপাক্ষ। বলে, উ আমার লাগবে নাই।

কেন? লাগবে নাই কেন?

না, লাগবে নাই।

এই এক কথা। কোয়ার্টার কেন লাগবে না, সেকথা সহজে বলতে চায় না।

নানাভাবে জিজ্ঞেস করে শেষপর্যন্ত জানা গেল যে 'ইসব ইটকাঠের কোঠা-বাড়িতে' বিরূপাক্ষর থাকতে ভালো লাগে না। ভালো লাগে না এই চোখ-ধাঁধানো ইলেকট্রিক বাতি। রূপনারায়ণপুরের কাছে এক সাঁওতাল-বসতিতে জায়গা খুঁজে নিয়েছে ও। অন্ধকার থাকতে খাবারের পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কাজে; ফিরে যেতে যেতে আবার অন্ধকার হয়ে যায়। সারাদিন এত হাঁটাহাঁটির পরেও এভাবে মস্ত মস্ত মাঠ পেরিয়ে লম্বা পাড়ি দিতে ওর নাকি একটুও কষ্ট হয় না।

আমি একরকম জোর করেই বিরূপাক্ষকে দিয়ে কোয়ার্টারের জন্যে দরখাস্ত করিয়েছিলাম। কারিগরপাড়ার একেবারে শেষ রাস্তায় কোয়ার্টার পেল ও। কারিগরপাড়ার শেষ রাস্তা এবং প্রোজেক্টের শেষ সীমানা। বিরূপাক্ষর কোয়ার্টারের পরেই পাথরছড়ানো অসমতল প্রান্তর গিয়ে শেষ হয়েছে একটা পাহাড়ের নিচে। সন্ধ্যার পরে পাহাড়টা যেন অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে আকাশের গায়ে কালো একটা ছোপ হয়ে ফুটে থাকে। দিনের বেলা হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিরূপাক্ষর কোয়ার্টারের ওপরেই।

কোয়ার্টার পেয়ে খুশি হল বিরূপাক্ষ। আমার কাছ থেকে খানিকটা তার চেয়ে নিয়ে সুন্দর বেড়া তুলল কোয়ার্টারের সামনের দিকে। তারপর দেখতে দেখতে মাস তিনেকের মধ্যেই সবুজ স্নিগ্ধতায় ভরে উঠল তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা সেই ছোট্ট জায়গাটুকু। সারি সারি সূর্যমুখী আর গাঁদাফুল। তারই মধ্যে আবার লাউ আর কুমড়োর মাচা, পেঁপে আর লঙ্কাগাছের ফাঁকে ফাঁকে টম্যাটোর লতা। কোথা থেকে যেন ঘাসের চাপড়া কেটে এনে লাগিয়েছে, রঙ ফিরে গেছে রুক্ষ গেরুয়া জমির। কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হয়, এই সবুজ স্নিগ্ধতার মধ্যে একটি মানুষের স-মনোযোগ পরিচর্যার কথা উচ্চস্বরে ঘোষিত হচ্ছে। ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বিরূপাক্ষকে। তারপরেও তার নিজের রান্নাখাওয়া আছে—এবং এত কাজের পরেও কি করে যে সে বাগানের পিছনে ব্যয় করবার মতোএতটা সময় পায় তা কিছুতেই ভেবে পাওয়া যায় না।

বিরূপাক্ষকে একদিন বললাম, বিরূপাক্ষ, দেশ থেকে বৌকে নিয়ে এস। এই বুড়ো বয়সে একা একা থাকতে তো কষ্ট হয়।

কথাটা শুনে বিরূপাক্ষর হাসি-হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে : না।

আমার মনে হল, আমি বোধ হয় কিছু অন্যায় বলে ফেলেছি। কাজেই চুপ করে গেলাম।

টেলিফোনে যে ক-জন খালাসী কাজ করে তারা প্রায় সকলেই একা-একা থাকে। দেশের বাড়িতে সকলেরই বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। কাছাকাছি যাদের বাড়ি তারা সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকে শনিবারের জন্যে। হোক একদিন, তবুও সকলেই একবার দেশ থেকে ঘুরে আসতে চায়। এমনও দু-একজন আছে যারা শনিবার রওনা হয়ে সোমবার সকালে ফিরে আসার মধ্যে দেশের বাড়িতে থাকতে পারে মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক সময়। বাকি সময়ের সবটুকুই কাটে ট্রেনে, কিংবা আলের পথে মস্ত মস্ত পাড়ি দেবার পদচারণায়, কিংবা নৌকোয়। কিন্তু তবুও যাওয়া চাই। জরুরী কাজ থাকলেও কিছুতেই আটকে রাখা যায় না। এমনি একজন খালাসী হচ্ছে বংশীধর।

বংশীধরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দেশের বাড়িতে তোর কে আছে রে?

বংশীধর বললে, কেন? মা আছে, বাবা আছে, ছোট ভাইবোন আছে, পিসীমা আছে…

আরো বলে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বৌ নেই?

বিয়া করি নাই আজ্ঞে।

বিয়ে করিসনি, বৌ নেই, তবে প্রত্যেক সপ্তাহে এত কষ্ট করে যাবার কি দরকার?

বংশীধর বললে, মা-বাপ বড়ো অস্থির হয়ে পড়ে যে!

তবে মা-বাবাকে নিয়ে আয় এখানে। কোয়ার্টার পেয়েছিস, তোর আর ভাবনা কি?

আজ্ঞে, ই চাকরির কি কোনো ঠিক্‌ঠিকানা আছে? আজ আছে কাল নাই।

তবে বিয়েসাদি কর্, বৌ এসে থাকুক তোর সঙ্গে।

একগাল হেসে বংশীধর বললে, সে ইচ্ছাও আছে আজ্ঞে। তবে·····

কি ভেবে কথাটাকে আর শেষ করে না। বুঝতে পারা যায় যে চাকরির স্থায়িত্বের ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করছে বংশীধরের।

দেশের বাড়িতে যাবার কথা মুখে আনে না একমাত্র বিরূপাক্ষ। ওকে যদি বলি, বিরূপাক্ষ, রবিবার কাজে আসতে পারবে?

ও বলে, কেন পারব নাই?

আমি বলি, রবিবারের ছুটি তোমার মারা যাবে না। রবিবারের বদলে অন্য এক-দিন ছুটি পাবে তুমি।

ছুটি চাই না আমার।

মুখের কথা নয়। সত্যিই ছুটি চায় না বিরূপাক্ষ। ছুটি নিয়ে কি করবে ও? সারা দিন বসে থাকতে থাকতে হাতে পায়ে খিল ধরে যায়। কোয়ার্টারের সামনে এই এক চিল্‌তে বাগান নিয়ে কতখানি সময় আর কাটানো যেতে পারে?

রবিবার সকালে বিরূপাক্ষ প্রায়ই এসে হাজির হয় আমার কোয়ার্টারে। সেই খড়ি-ওঠা খাকি শার্টটা গায়ে থাকে না বলে তখন হঠাৎ চেনা যায় না ওকে। অদ্ভুত রকমের ভাঁজ দিয়ে দিয়ে একটা ধুতি পরে, কোমরে জড়ায় একটা লাল গামছা, গায়ে একটা গেঞ্জি, খালি পা। এই ছুটির দিনেও সাতটা বাজতে না বাজতেই ওর স্নান করা হয়ে গেছে, দুপুরের রান্নার পাট শেষ, আপিসের পোশাক সেই খাকি শার্টটাও কেচে রেখে এসেছে।

আমি জিজ্ঞেস করি, কি বিরূপাক্ষ, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছ বুঝি?

বিরূপাক্ষ হঠাৎ যেন রেগে ওঠে: ই খট্টাস্ জায়গায় কিচ্ছু নাই! কিচ্ছু নাই!

কী নাই ?

কিচ্ছু নাই !

পরিষ্কার করে বলতে পারে না, কী ও চেয়েছিল, কিসের অভাব বোধ করছে। হঠাৎ হয়তো আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুই হোটেলে খাস্ কেন ?

আমি হাসতে হাসতে বলি, তুই আমাকে রান্না করে খাওয়াবি ?

বিরূপাক্ষ বলে, আমার হাতের রান্না তুর ভাল লাগবে নাই। একটু থেমে আবার বলে, মরদ আছিস, নিজের রান্না নিজে করতে পারিস না ? তারপর আরও কি বলতে গিয়ে চুপ করে থাকে।

খানিকক্ষণ এঘর ওঘর ঘোরাঘুরি করে, মেঝের ওপর পাতা আমার বিছানার দিকে আর বিছানার চারপাশে ছড়ানো বইপত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। উঠোনে জঙ্গল হয়ে আছে সেদিকে তাকিয়ে একটু যেন বিরক্ত হয়। তারপর কিছু না বলেই চলে যায় একসময়ে।

এক ছুটির দিনে হঠাৎ একটা কোদাল নিয়ে এসে হাজির। বললে, উঠান সাফ করব আর জমি কুপিয়ে দেব।

আমি বললাম, দূর, ওসব করে কি হবে ?

বিরূপাক্ষ অবাক হল : কেন ? বাগান তুর ভালো লাগে না ?

আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম যে ভালো লাগে কিনা, প্রশ্নটা তা নয়। এখানে নেহাতই চাকরি করতে আসা, হয়তো আজ আছি কাল নেই। কি লাভ এসব ভূতের খাটুনি খেটে ?

টান হয়ে দাঁড়িয়ে বিরূপাক্ষ বললে, জমির অযত্ন করতে নাই—সে যার জমিই হোক।

কথাটাকে আমি হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বিরূপাক্ষের সেই এক কথা। মাটি হচ্ছে মা ; মা-কে অবহেলা করলে যেমন পাপ হয়, মাটিকে অবহেলা করলেও তাই।

বিরূপাক্ষ বললে, রাস্তার মানুষ এই ফাঁকা জমির দিকে চক্ষু মেলে তাকায় আর

ভাবে, ই বাসায় মানুষ থাকে না। সিটা খুব ভালো কথা?

রাস্তার মানুষ যদি ভাবে তো ভাবুক।

সিটা খুব ভালো কথা? তুর মা যদি ছেঁড়া কাপড় পরে—তাহলে পাঁচজনা কি তুকে ভালো বলে?

হাল ছেড়ে দিয়ে আমি বললাম, বেশ বাপু যা খুশি করো।

বিরূপাক্ষ যে সত্যিই মাটিকে মা বলে মনে করে সেটা বোঝা যায় ওর কোয়ার্টার দেখলে। ছোট্ট একটুখানি জমির প্রতিটি ইঞ্চিকে ব্যবহার করে যেভাবে ও ফুলের গাছ ও তরি-তরকারি লাগিয়েছে তাতে বোঝা যায় যে এর পেছনে ওর অনেক দিনের অনেক চিন্তা ও পরিশ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। রাস্তার লোককে তাকিয়ে দেখতে হবে এবং দেখে তারিফ করতে হবে। মাটি-মাকে পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছে বিরূপাক্ষ।

আমাকে একদিন ও নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিল। সেদিন ওর কোয়ার্টারের ভেতরটাও ভালো করে দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। দেখলাম উঠোনের এক চিল্‌তে জমির ওপরে তৈরি করেছে তুলসী-বেদী আর চারদিকে লাগিয়েছে ঢ্যাঁড়স ও ডাঁটা গাছ। ঘরদোর তক্‌তকে করে ধোয়ামোছা। চকচকে কাঁসার থালাবাসন। গোবরলেপা পরিষ্কার উনুন। এমনকি দেখলাম যে দড়ির খাটিয়ার ওপরে স্বল্প আয়োজনের বিছানাটিও পরিপাটি। বেশ বোঝা যায় যে ওর বেঁচে থাকার মধ্যে এতটুকু ফাঁকি বা দায়সারা গোঁজামিল নেই।

খেতে বসে বলেছিলমে, বিরূপাক্ষ, তোমার কোয়ার্টারকে এমন সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছ যে মনেই হয় না তোমার বৌ-ছেলেমেয়ে এখানে নেই।

বিরূপাক্ষ বললে, মরদ কি আর কাজ ডরায়?

বৌ-ছেলেমেয়েকে আনবে না?

না।

আনবে না কেন?

মানুষের থাকবার জায়গা ইটা নয়। কী আছে এখানে? কিচ্ছু নাই।

আরও একটা কিছু চায় বিরূপাক্ষ। কিন্তু কিছুতেই ব্যাখ্যা করে বলতে পারে না, অভাববোধটা কিসের।

তারপরেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার রোঁদে বেরিয়েছিলেন। যাদের যাদের কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে, তারা সকলে সত্যিই কোয়ার্টারে থাকে কিনা—এটা দেখাই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। দুজন জুনিয়র অফিসার সমভিব্যাহারে আপিসের ল্যাণ্ডরোভারে চেপে কারিগরপাড়ার কয়েকটি রাস্তা ঘুরে মস্ত এক তালিকা তৈরি করলেন তিনি। দেখা গেল ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ারের তালিকায় বিরূপাক্ষর নামও উঠে গেছে। কোনো রকম কৈফিয়ত চাওয়া হল না। মস্ত একটা চার্জশীট দিয়ে আরও অনেকের সঙ্গে বিরূপাক্ষকেও বরখাস্ত করা হল।

ভোর সাতটার সময়ে যথারীতি কাজে এসেছিল বিরূপাক্ষ। হাজিরা ডাকার আগেই দড়ি, তার, দুরমুশ ইত্যাদি নিয়ে তৈরি হয়েছিল কাজের জন্যে। বরখাস্তের নোটিসের ওপর টিপসই নিয়ে কাগজটা ওর হাতে দিতেই ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইটা কী?

ওকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললাম, কাগজটা কেন ওকে দেওয়া হয়েছে।

মুখখানাকে হাঁ করে ও মন দিয়ে শুনল আমার কথা, তারপর বললে, ই কেমন কথা? আমি থাকি নাই তো বাগান করিছে কে?

আরও বারোজন খালাসী ও তিনজন মিস্ত্রী সেখানে ছিল। ব্যাপারটা শুনে অবাক হয়ে গেল সকলে। খালাসীদের মধ্যে বিরূপাক্ষর কোয়ার্টারই সবচেয়ে সাজানো গোছানো। বিশেষ করে কোয়ার্টারের সামনে যে বাগানটুকু ও করেছে তাতে প্রাত্যহিক পরিচর্যার ছাপটা এত স্পষ্ট যে তা যে-কোনো লোকের চোখে পড়ে। তাছাড়া 'এ'-টাইপ কোয়ার্টারের চৌকাঠহীন জানলা চেষ্টা করলেও নিশ্ছিদ্র করে বন্ধ করা যায় না। দুই কপাটের মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁক থেকে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে একবার তাকালেই ঘরের ভেতরকার দৈনন্দিন বসবাসের নানা আয়োজন চোখে পড়তে পারত।

ব্যাপারটা নিয়ে খালাসীরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস আলোচনা করছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ই আমি মানবো নাই! তারপর অন্য খালাসীদের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে, চল্ রে কাজে যাই।

বিরূপাক্ষকে বুঝিয়ে বললাম যে বিরূপাক্ষর আজ আর কাজে যাওয়া চলবে না। ওপরওলার হুকুম, তার নড়চড় হবার উপায় নেই কিছুতেই।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিরূপাক্ষ জিজ্ঞেস করল, কোন্ ওপরওলার হুকুম ইটা?

ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ারের নাম করলাম।

খালাসীদের সামনে গিয়ে বিরূপাক্ষ হঠাৎ প্রচণ্ড এক হাঁক দিয়ে উঠল, তুরা মরদ হোস তো আয় আমার সঙ্গে। দেখি আসি সাহেবের চক্ষুদুটো আছে কি নাই!

অন্য খালাসীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

মরদ হোস তো আয় আমার সঙ্গে!

একজন খালাসীও যখন উঠে দাঁড়াল না, তখন হতাশ হয়ে বসে পড়ে বললে, ই জায়গায় মানুষ থাকে! আমি থাকব নাই! কিচ্ছু নাই ইখানে!

পুরো পনের দিন বিরূপাক্ষকে বরখাস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল। বিরূপাক্ষকে দিয়ে দরখাস্ত দেওয়ালাম, বিরূপাক্ষ যে সত্যি সত্যিই কোয়ার্টারে থাকে তার কয়েকটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ উল্লেখ করে আমি নিজেও রিপোর্ট দিলাম একটা। তারপরেও পুরো পনের দিন লাগল বরখাস্তের আদেশ নাকচ হতে।

বিরূপাক্ষ আমাকে অনুরোধ করেছিল, ওকে যেন আমি বসিয়ে না রাখি। অন্য খালাসীদের সঙ্গে কাজে যেতে চেয়েছিল ও। কিন্তু ওর এই অনুরোধটুকু রক্ষা করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সে-সময়ে বিরূপাক্ষকে দেখে মনে হত, যেন ও একটা শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। যথারীতি ভোর সাতটার সময় স্নান করে খেয়ে এবং খাবারের পুঁটলি হাতে নিয়ে কাজে আসে। সারাদিন পা ছড়িয়ে বসে থাকে আমার আপিসের

ামনে বারান্দায়। বারোটার ভোঁ বাজলে পুঁটলি খুলে খাবার খায়। আর
ালাসীরা যখন একসঙ্গে জড়ো হয় তখন মাঝে মাঝে হঠাৎ প্রচণ্ড হাঁক দিয়ে
ঠে, চল তো দেখি আসি, সাহেবের চক্ষুদুটা আছে কি নাই !
ন্য খালাসীরা চুপ করে থাকে।
ানের দিন পরে আবার যখন ও চাকরিতে বহাল হল তখন যতোটা খুশি ও
বে ভেবেছিলাম তা কিন্তু হল না।
ামি একদিন বলেছিলাম, বিরূপাক্ষ তোমার বৌ ছেলেমেয়েকে নিয়ে এস
খানে। দেখছ তো, কোয়ার্টার খালি থাকলেও এখানে বিপদ।
িরূপাক্ষ বললে, না।
। কেন ?
নিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বিরূপাক্ষ একেবারে যেন ফেটে পড়ল : ই জায়গায়
নুষ থাকে! একটা হাঁক দিলি পাঁচজনা উঠি দাঁড়ায় না—ই ক্যামন খট্টাস্
ায়গা!
খানে একজনের পেছনে পাঁচজন এসে দাঁড়ায় না তেমন জায়গায় বৌ-ছেলে-
য়েকে আনবে না বিরূপাক্ষ। ওপরওলার হুকুমে দিন যেখানে রাত হয়ে যায়
খানে ভরসা করবার মতো কোনো অবলম্বনই ও খুঁজে পাচ্ছে না।



হঠাৎ একদিন এ-পি-ও আমাকে আরেকবার তাঁর কামরায় ডেকে পাঠালেন। আর অফিসারের ডাক সব সময়েই জরুরী, সমস্ত কাজ ফেলে ছুটে যেতে হবে। আমি তখন এক্স্‌চেঞ্জের রিলে র‍্যাক-এ নতুন কয়েকটা লাইনের তার লাগাচ্ছিলাম, ডাক শুনেই ছুটতে হল ওপরে।

এ-পি-ওর ঘরে ঢুকে দেখি, এ-পি-ওর হেডক্লার্ক অনেকগুলো ফাইল বগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে, আর এ-পি-ও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে একটা চিঠি পড়ছেন। আমাকে দেখেই এ-পি-ও হেডক্লার্ককে বললেন, আপনি এখন যান, আপনাকে পরে ডেকে পাঠাবো। তারপর আমাকে বললেন, বসুন। হেডক্লার্ক ভদ্রলোক আমার দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। এই তীব্র দৃষ্টির অর্থ আমি জানি। হেডক্লার্ক আমার চেয়ে বেশি মাইনে পান। অথচ তাঁরই সামনে এ-পি-ও আমাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, এতে তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে। এই তীব্র দৃষ্টির অর্থ : ভেব না যেন তুমি আমার চেয়ে উঁচু দরের লোক! অপ্রাসঙ্গিক হলেও আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে। স্পর্ধিত আত্মম্ভরিতার এর চেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই, সুতরাং ঘটনাটি বলছি। আমার মেসোমশাই একজন প্রখ্যাতনামা রামকৃষ্ণভক্ত, নানা জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসে। তিনি এখানকার রামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসভায় যোগ দিয়েছিলেন। ছিলেন মাত্র ঘণ্টা দুয়েক, প্রোজেক্ট্‌ ঘুরে দেখবারও অবসর পাননি। মাসীমা আমাকে অনেক আগে থেকেই চিঠিতে এই খবর জানিয়েছিলেন এবং বার বার বলেছিলেন আমি যেন

এই সভায় তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমার যেতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, তখন সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে। যথারীতি ডি-জি-এম সভাপতিত্ব করছেন। দূর থেকে তাকিয়েই বুঝলাম, মাসীমা ও মেসোমশাইকে ঘিরে অফিসার ও অফিসার পত্নীরা যে ব্যূহ রচনা করেছেন তা ভেদ করা আমার অসাধ্য। সুতরাং সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। সভার শেষেও সেই ব্যূহ ভেদ করতে পারিনি, কিন্তু শেষপর্যন্ত অনেক দূর থেকে মাসীমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম। আমাকে দেখতে পেয়েই মাসীমা একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে এগিয়ে এলেন : কি রে, এত দেরি করলি, আয়, আয়। বলে তিনি আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে সেই ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছিস রে তোরা? চারদিকের অফিসার ও অফিসার-পত্নীরা প্রথমে হতবাক, তারপরে আরক্তদৃষ্টি। সেই জোড়া-জোড়া অগ্নিবর্ষী চোখ আজো একটা দুঃস্বপ্নের মতো মাঝে মাঝে আমার কল্পনায় প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ডি-জি-এম পত্নীর কাছে মাসীমা আমার পরিচয় দিলেন : এই যে, আমার বোন-পো। ডি-জি-এম-পত্নী একবার শুধু ঘাড় নাড়লেন। মুখের ভঙ্গিটুকু আমি দেখতে পাইনি, তার আগেই নাকে রুমাল চাপা দিতে গিয়ে তিনি মুখের অর্ধাংশ ঢেকে ফেলেছেন।

যে-কথা বলছিলাম। এ-পি-ও আমাকে চেয়ারে বসতে বলে কলিং-বেল টিপে চাপরাশিকে ডাকলেন। চাপরাশি ঢুকতেই হুকুম হল, কেউ যেন এখন ঘরে না ঢোকে। চাপরাশি বললে, জী হুজুর! তারপরে সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছিল। অফিসার ঘরে ডেকে চার্জশীটের হুমকি দিলে অস্বাভাবিক মনে হয় না, কিন্তু চেয়ারে বসিয়ে গোপন কথা বলতে চাইলেই বুক ঢিবঢিব করে। এ-পি-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। চল্লিশোত্তর বয়স, গোলগাল ফুলোফুলো মুখ। হঠাৎ মনে হয়, মুখের এই মাংসাধিক্যের মধ্যেও একটা চোয়াড়ে অশ্লীলতা লুকিয়ে আছে। ড্যাবডেবে চোখদুটোতে যেন একটা কুৎসিত ইঙ্গিত।

এ-পি-ওর সামনে একটা খোলা প্যাড পড়েছিল। সেই প্যাডের সাদা পাতায় একটা লম্বা আঁচড় টেনে তিনি আমাকে বললেন, এখানে আপনার চাকরির খুব ব্রাইট প্রস্‌পেক্‌ট আছে তা আপনি জানেন নিশ্চয়ই?

আমি জানতাম না। কিন্তু এইটুকু জানতাম, শুধু এই কথাটুকু শোনাবার জন্যেই এ-পি-ও আমাকে ডেকে পাঠাননি। আমি চুপ করে রইলাম। এ-পি-ওর আসল বক্তব্য নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে, এ-কথাটা ভূমিকা মাত্র, সেই আসল কথাটুকু না শোনা পর্যন্ত চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ—অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় এটুকু আমি বুঝেছি।

সাদা কাগজটার ওপরে আরেকটা আঁচড় টেনে এ-পি-ও আবার বললেন, অফিসাররা আপনার কাজ দেখে খুশি হয়েছেন।

তবুও আমি চুপ করে রইলাম।

সাদা কাগজটার ওপর হিজিবিজি কাটতে কাটতে এ-পি-ও বলে চললেন, ইয়ং ম্যান, চীয়ার আপ। আমি আপনাকে ব্যাক্ করব।

এমন ভঙ্গিতে কথাটা বললেন এবং প্রত্যাশায় এমন উন্মুখ হয়ে রইলেন যে আমার মনে হল, আমি ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘোড়া ছুটছি।

উল্লাসে ডগমগ হবার যথেষ্ট সময় দেবার পরেও আমার মুখে কোনো ভাবান্তর না দেখে তিনি চোখ ঘোঁচ করে তাকালেন খানিকক্ষণ এবং তারপর হঠাৎ খুব অন্তরঙ্গ স্বরে হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

আমি বললাম, আপনার কোনো কথাই আমি বুঝতে পারছি না।

তেমনি অন্তরঙ্গ স্বরে তিনি বললেন, কিছু বুঝতে হবে না ভাই! আপনাকে শুধু একটি কাজ করতে হবে, বাকি সমস্ত বোঝাবুঝির ভার আমার।

জিজ্ঞেস করলাম, কী কাজ?

তিনি বললেন, তেমন কিছু শক্ত কাজ নয়। এ ভেরি প্লেজেণ্ট জব! আপনাকে একটি বিয়ে করতে হবে। ভাববেন না কালো কুচ্ছিৎ মেয়েটি, শি ইজ এ বিউটি!

বিউটি কিনা আমি জানতে চাইনি। কিন্তু হঠাৎ এই বিয়ের প্রস্তাব শুনে আমি এত অবাক হলাম যে মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না।

এ-পি-ও বলে চলেছেন, রিয়েলি শি ইজ্ এ বিউটি! আপনি দেখলে মুগ্ধ হবেন। ইয়ং ম্যান, বিয়ে করাটা জীবনেরই একটা ধর্ম। বুঝতে পারছেন না যে আপনার লাকি স্টার আপনাকে ফেভার করছে তাই এই অদ্ভুত যোগাযোগ! কোথায় ছিল সুধন্যা আর কোথায় ছিলেন আপনি? এ স্ট্রেন্জ্ কয়েন্সিডেন্স।

এবার আমি রীতিমত চমকে উঠলাম। সুধন্যা? সুধন্যা গোস্বামী? সেই ম্লান-মুখ গৌরাঙ্গী মেয়েটি? মেয়েটিকে আমি বহুদিন বাবুপাড়া থেকে বাসে চেপে আপিসে আসতে দেখেছি। বিউটি কিনা জানি না, কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকালেই আমার মনে হত যেন ব্যথা ও যন্ত্রণার মূর্তমতী রূপ। ভোরের আকাশে ক্ষণচকিতা ভেনাসের মতো।

তা ছাড়াও কথা আছে। সুধন্যাকে দেখার আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোনের' মতো মেয়েরা দুই জাতের— মা ও প্রিয়া। "ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব। আর প্রিয়া বসন্তঋতু! গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায় যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয় বাণী।" সুধন্যাকে দেখার পর আমার মনে হয়েছে মা ও প্রিয়া ছাড়াও আরেক জাতের মেয়ে আছে—দিদি। হেমন্তঋতু। বর্ষার আর্দ্রতা আর বসন্তের উত্তাপ যেখানে এসে মিলেছে, বর্ষার সম্ভাবনা আর বসন্তের রূপায়ণ যেখানে পাকা ফসলের আশ্বাস হয়ে ফুটে ওঠে। কুয়াশাম্লান আর শিশিরশুভ্র হেমন্ত-ঋতু। সুধন্যা সেই দিদি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে এ-পি-ও বললেন, বেশ তো আপনি ভেবেচিন্তে দেখুন, দু-দিন পরে জবাব দেবেন।

আমি যন্ত্রচালিতের মতো উঠে এলাম। দু-দিন সময় নেবার জন্যে নয়, এই মূর্তিমান অশ্লীলতার সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে আসবার জন্যে।

উঠে আসতে আসতে এ-পি-ওর শেষ কথা শুনলাম : একটা কথা মনে রাখবেন। আপনার চাকরির ভালো-মন্দ দুই করবার ক্ষমতা আমার আছে।

হিজিবিজি কাটা প্যাডের কাগজটার ওপরে আমার নজর পড়ল। একটা অমানুষিক চেহারা হিংস্র দুটি হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে কাউকে যেন গ্রাস করতে চাইছে।

তার পরের দু দিনে উড়ো-উড়ো অনেক খবরই আমি শুনতে পেলাম। রোজ সকালে আপিসে আসবার সময় এ-পি-ও নাকি সাহেবপাড়া থেকে বাবুপাড়ায় হেঁটে এসে বাস ধরেন। ল্যাণ্ডরোভার ছেড়ে বাসে আসাটা একজন বড়ো অফিসারের বড়ো রকমের খামখেয়াল বলেই হয়তো ধরে নেওয়া যেত। কিন্তু দেখা গেল, সুধন্যার পাশের খালি সীটটির দিকেই এই অফিসারের বিশেষ নজর। প্রথম প্রথম সুধন্যা নিজেই বসতে বলত, পাশের সীটটি খালি থাকতেও এতো বড়ো একজন অফিসার দাঁড়িয়ে যাবেন তা তো আর হতে পারে না! তারপরে তিনি আর বলবার অপেক্ষা রাখেননি। এবং চাকরির ভালো-মন্দ দুই করবার ক্ষমতা যার আছে এবং যে মেয়ে বৃহৎ এক সংসারের বোঝা নিয়ে বিপর্যস্ত—এই দুজনের মধ্যে বাসের সীট ছাড়াও অন্যত্র যোগাযোগ হতে খুব বেশি সময় লাগে না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। জেনেশুনেও সকলে চুপ করে থাকে।

এসব উড়ো খবরের কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে আমি জানি না। কিন্তু সুধন্যাকে পাত্রস্থ করবার জন্যে এ-পি-ওর এই অহেতুক ব্যগ্রতা দেখে আমার বার-বার মনে হতে লাগল, একটা ব্যভিচারকে সামাজিক স্বীকৃতির প্রলেপ দিয়ে চাপা দেবার ষড়যন্ত্র চলেছে।

ঠিক দু-দিন পরে এ-পি ওর ঘরে আবার আমার ডাক পড়ল। আমি যেতেই

তিনি সেদিনকার মতো বললেন, বসুন। তারপরে সোজাসুজি কথা পাড়লেন, এই বৈশাখ মাসের মধ্যেই আমি দিন ঠিক করতে চাই।

আমি বললাম, আমার পক্ষে এ বিয়ে করা সম্ভব নয়।

ঘরে যেন বজ্রপাত হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আপনি চাকরির পরিণামের কথা ভালোভাবে চিন্তা করে একথা বলছেন তো?

তারপরে আমার সামনেই তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, সেদিনকার দেখা প্যাডের কাগজের সেই অমানুষিক চেহারাটা আমার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। দুই হিংস্র হাত বাড়িয়ে গ্রাস করতে আসছে আমাকে। মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলাম।



দিন তিনেক পরে এক শনিবারের সন্ধ্যায় কোয়ার্টারে বসে আছি, হঠাৎ শম্পা এসে হাজির। শম্পার এই অভ্যেসটা আমি বলে বলেও দূর করতে পারিনি। যখন-তখন কোয়ার্টারে এসে হাজির হয়। আমার নিজের জন্যে কিছু নয়, কিন্তু শম্পার নামে কানাঘুষোতেও কিছু আলোচনা ওঠে তা আমি চাই না। শম্পাকে বললে শম্পা হাসে, বলে, বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছে হল তাই চলে এসেছি। তাড়িয়ে দিচ্ছেন তো ফিরে যাই।

আর চাও খেতে পারে মেয়েটা। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে, অনেক দিন মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে চা খায়। আর যদি এমন সঙ্গী থাকে যে ওর সঙ্গে চায়ে পাল্লা দিতে পারবে তাহলে তো আর কথাই নেই। অনেক দিন এমন হয়েছে, ওকে খুশি করবার জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি চা খেয়েছি। কোনো মানুষকে যে এত অল্পে খুশি করা যায় সে-ধারণা আমার ছিল না।

সেদিন কিন্তু শম্পা চায়ের তৃষ্ণা নিয়ে আসেনি। ঢুকতেই দেখলাম, মুখচোখ কেমন শুকনো। আমাকে বললে, কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে, মার শরীর খুব খারাপ।

কিছু দিন আগে শম্পার মা কলকাতায় গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে শম্পার এক পিসীমা এসেছিলেন এখানে।

চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে শম্পা বললে, পড়ে দেখুন।

চিঠিটা লিখেছেন শম্পার বাবা। মেয়ের যাতে দুশ্চিন্তা না হয় সেজন্যে যথেষ্ট ঢেকে-রেখে লিখেছেন। কিন্তু যেটুকু লিখেছেন তাতেই যে-কোনো মেয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে! শম্পার মার রক্তচাপের পরিমাপ সব সময়েই অস্বাভাবিকের ঘরে থাকে। সহসা সেই অস্বাভাবিক রক্তচাপ আশঙ্কাজনক উল্লম্ফন দিয়েছে।

চিঠি থেকে চোখ তুলেই দেখি, শম্পার চোখদুটো টস্‌টস করছে; বললে, আমি আজই কলকাতায় যাব।

আমি বললাম, সে কি? সেই রাত বারোটায় ট্রেন, একা যাবেন কি করে? কাল দিনের ট্রেনে যান।

শম্পা বললে, না, আমি আজই যাব।

আমি আবার বললাম, কিন্তু একা যাবেন কি করে?

শম্পা বললে, আমি যেতে পারি। কিন্তু পিসীমা আপত্তি করছেন। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন না?

সেই কান্না-আরক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুতেই 'না' বলতে পারলাম না। আমি নিজেও অনেক দিন কলকাতায় যাইনি। মন্দ কি!



আমি পরদিনই কলকতা থেকে ফিরে এলাম। শম্পা ফিরল আরো দিন দুয়েক পরে, একেবারে মাকে সঙ্গে নিয়ে। ওর মার শরীর নাকি এখানেই ভালো থাকে।

এই নিয়ে যে কোনো কথা উঠতে পারে সেই ধারণা আমার ছিল না। আমরা দুজনে একসঙ্গে কলকাতায় গিয়েছি, সকলের চোখের ওপর দিয়েই গিয়েছি, এমনকি যে-কামরায় আমরা উঠেছিলাম সেই কামরাতেও জনকয়েক স্থানীয় লোক ছিল—সুতরাং শম্পাদের বাড়ি থেকে শুরু করে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত আগাগোড়া পথেই কেউ না কেউ আমাদের দেখেছে—কথা যদি ওঠে তো এই কথাটুকুই উঠুক যে আমরা দুজনে মধ্যরাত্রির ট্রেনে একসঙ্গে ভ্রমণ করেছি। কিন্তু দিন সাতেকের মধ্যে যে কাহিনী শুনতে হল তাতে শিউরে উঠে কানে আঙুল দিতে হয়।

শুনলাম, শম্পা আর আমি নাকি সেদিন রাত বারোটার ট্রেনে কলকাতায় যাইনি, শম্পাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আমি নাকি ঘুরপথে আবার আমার কোয়ার্টারে ফিরে আসি, শম্পা নাকি আমার কোয়ার্টারেই রাত্রিবাস করেছে এবং আমরা কলকাতায় গিয়েছি পরদিন ভোর ছটার ট্রেনে। প্রমাণ? প্রমাণের অভাব কি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটর গাঙ্গুলী সাক্ষী দেবে, আমি নাকি সেদিন ভোর পাঁচটায় আমার কোয়ার্টারের টেলিফোন থেকে সময় জিজ্ঞেস করেছি এবং

তারপর টেলিফোনে স্টেশন থেকে খোঁজ নিয়েছি ভোরের ট্রেন ঠিক সময়ে আসছে কিনা।

এই কাহিনী শুনে আমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা এখন আর আমার স্পষ্ট মনে নেই। তবে এটুকু আমার মনে আছে যে আমার সব চেয়ে বড়ো চিন্তা হয়েছিল শম্পা সম্পর্কে। সব মেয়েই তো আর সুস্মিতা চ্যাটার্জি নয়, অনেক সাধারণ মেয়ে এই অবস্থায় একেবারে ভেঙে পড়ে। অনেকে আত্মহত্যা করে বসে এমন কথাও শুনেছি।

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, সন্ধ্যেবেলা একবার শম্পাদের বাড়ি যাব। শম্পা যদি ইতিমধ্যেই এসব কথা শুনে থাকে তবে আমার কাজ হবে এসব কুৎসাকে দু-পায়ে মাড়িয়ে চলবার মতো দৃঢ়তা শম্পার মধ্যে সৃষ্টি করে আসা, আর যদি না শুনে থাকে তবে এজন্যে শম্পার মনকে তৈরি করে তোলা। আমার মনে হয়েছিল, একটি নিরীহ কুমারী মেয়ের মান সম্ভ্রম এমনকি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত—সুতরাং ব্যাপারটিকে যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু আমার একার নামে কুৎসা হলে আমি হয়তো ভ্রূক্ষেপই করতাম না।

শম্পাদের বাড়ি কেরানিপাড়ার এগারো নম্বর রাস্তায়। কেরানিপাড়ার অবস্থানটা একটু অদ্ভুত। সবুজ পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে যদি তাকানো যায় তবে পুব দিকে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং ও কারখানা, পশ্চিমে সাহেবপাড়া, উত্তরে বাবুপাড়া। আর পাহাড়ের ঠিক নিচেই উত্তরপূর্ব কোনাকুনি অর্ধবৃত্তাকার কয়েকটা রাস্তা! কেরানিপাড়া। রাস্তার পরেই ছেলেমেয়েদের খেলার জন্যে মস্ত একটা পার্ক।

শম্পাদের বাড়ি কেরানিপাড়ার শেষ রাস্তায়, অর্থাৎ পাহাড়ের ঠিক নিচেই। বারান্দায় বসে সামনের দিকে তাকালে অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ, তারপরে রেলের লাইন। আর ডানদিকে বাড়ির গা ঘেঁষে সবুজ পাহাড়। এই এগারো নম্বর রাস্তাটাই পাহাড়টাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে সোজা পাহাড়ের মাথায় উঠেছে। বছরে তিনদিন এই রাস্তা দিয়ে জেনারেল ম্যানেজার ও অফিসারদের ল্যাণ্ডরো-

ভার সোজা গিয়ে পাহাড়ের ওপরে ওঠে। জেনারেল ম্যানেজার তিনরঙা ঝাণ্ডা উড়িয়ে বক্তৃতা করেন, অফিসাররা তদ্গত হয়ে শোনে, সরকারী বুলেটিনে ফলাও করে বক্তৃতা ও ছবি ছাপা হয়। এই তিনটে দিন হচ্ছে ছাব্বিশে জানুআরি, পনেরই আগস্ট ও দোস্‌রা অকটোবর। গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিয়ে গান হয়, প্রথম দুটি দিনে জনগণমন, তৃতীয় দিনে রঘুপতিরাঘব।

বছরের অন্যান্য দিনে এই রাস্তায় বড়ো একটা লোক চলাচল নেই। সন্ধের পরে সবুজ পাহাড়ের মাথায় সেই আশ্চর্য সবুজ আলোটা জ্বলে ওঠে, ডিসেম্বরের আকাশে বৃহস্পতির মতো। অনেক দূরে টুকরো টুকরো আলোসমন্বিত একটা রেখা রেলের লাইনের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যায়। অন্ধকার মাঠে জোনাকির আলো দপদপ করে।

সন্ধেবেলা যে ক-দিন শম্পাদের বাড়িতে এসেছি, দূর থেকেই দেখি শম্পা আর শম্পার মা বারান্দায় মাদুর পেতে বসে আছে। আমি গেলে দুজনেই ভারি খুশি হত; খুশি হবার সবচেয়ে প্রত্যক্ষ কারণটা ছিল আরেকবার চা খাবার একটা উপলক্ষ। শম্পার মা ছিলেন যাকে বলা যায় চায়ের সমঝদার। তাঁর চা আসত কলকাতা থেকে। সারা দিনে তিনি বার ছয়েক চা খেতেন। তাঁর রান্নার কথা আগেই বলেছি, চা তৈরির ব্যাপারেও তিনি ছিলেন উঁচুদরের শিল্পী। নিজে চা খেতে ভালবাসতেন, অপরকে চা খাওয়াতে আরো বেশি ভালবাসতেন।

আমি গেলেই শম্পার মা চা করে আনতেন। অন্ধকার বারান্দায় বসে তিনজনে চা খেতাম। সবুজ আলো আর জোনাকিজ্বলা দূরবিসর্পী প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হত যেন আশ্চর্য এক কবিতার দেশ। অল্প অল্প চুমুক দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমরা চা খেতাম।

সেই ষোলো মাসের জীবনের অনেক ঘটনাই ভুলে গেছি, কিন্তু সেই কয়েকটি আশ্চর্য সন্ধ্যা এখনো রঙেরেখায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সেদিন সন্ধেবেলা দূর থেকেই দেখতে পেলাম, শম্পাদের বাড়ির বারান্দায় কেউ নেই। বাড়ির কাছাকাছি এসে শুনতে পেলাম, শম্পা প্রবলভাবে হারমোনিয়াম

বাজিয়ে উচ্চগ্রামে গলা সাধছে। অভ্যেসটা শম্পার পক্ষে নতুন, আমি একটু অবাক হলাম।

আগেই বলেছি 'বি'-টাইপ কোয়ার্টারে দুটি মাত্র ঘর। বড়ো রাস্তা দিয়ে ঢুকতে হলে প্রথমে একটি বড়ো ঘর, এই বড়ো ঘরের ভেতর দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে যাবার রাস্তা। অবশ্য পেছনের বারান্দায় দুই ঘর থেকে দুটি আলাদা দরজা আছে। এই বারান্দার একপাশে রান্নাঘর, অন্যপাশে ভাঁড়ারঘর। রান্নাঘরের পেছন দিকে কল-চৌবাচ্চা-পায়খানা, একপাশে দেওয়ালঘেরা উঠোন, পেছন দিকে খিড়কির দরজা।

শম্পা বসেছে বড়ো ঘরটিতে সুতরাং শম্পার মনোযোগে যদি ব্যাঘাত করতে না হয় তবে এখন আর বাড়ির ভেতর ঢোকা চলে না। অন্ধকার বারান্দার এক কোণে বসে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'বি'-টাইপ বাড়ির এই এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকলে অবশ্য যে-কোনো ঘরে সরাসরি ঢুকতে পারা যায়, কিন্তু সদরের দিকে এক ঘরের ভেতর দিয়ে অন্য ঘর। অথচ ছোট ঘরটির আগাগোড়া দৈর্ঘ্য জুড়ে বাইরের বারান্দা, অনায়াসে বাইরের দিকে একটা দরজা ফুটিয়ে দেওয়া যেতে পারত। তবে এখানে 'বি'-টাইপ জীবনযাত্রার একটা পূর্ব-নির্ধারিত সূক্ষ্ম হিসেব আছে, একটি বাড়তি দরজার ফাঁক দিয়ে সেই হিসেব হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা বোধ হয় কর্তৃপক্ষ করেছেন।

হঠাৎ হারমোনিয়ামের একাধিক রীড্-টেপা একটা শব্দঝংকার তুলে শম্পার স্বরসাধনা বন্ধ হল। তারপরেই শম্পার গলা শুনতে পেলাম, মা, আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

শম্পার মা বললেন, যা খুশি কর, আমাকে জিজ্ঞেস করা কেন?

আমার একটু খট্‌কা লাগল। মা-মেয়ের মধ্যে এ ধরনের কথাবার্তা সাধারণত হয় না। আড়ালে দাঁড়িয়ে আর কোনো কথা শুনতে না হয় সেজন্যে সশব্দে দরজা খুলে আমি ভেতরে ঢুকলাম।

শম্পার মা চা তৈরি করলেন। কিন্তু কেমন যেন থমথমে আবহাওয়া।

অনেকক্ষণ পর শম্পার মা বললেন, বেড়াতে যাবি বলছিলি, যা একটু ঘুরে আয়।

শম্পা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন একটু পাহাড় থেকে ঘুরে আসি। যাবেন? বলে শম্পা মুখ ধুতে গেল।

আমি চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি শম্পার মায় চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে। আমি তাকিয়ে আছি দেখেও লুকোবার চেষ্টা করলেন না। কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বললেন, আজ সারা বিকেল মেয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। বলে, আমার অসুখের খবর দিয়ে কেন ওকে চিঠি লেখা হয়েছিল? আর চিঠি যদি লেখা হল তো এমন চিঠি লেখা কেন যে একজনকে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ছুটতে হয়? বলো তো বাবা, মার অসুখের খবর মেয়েকে জানিয়ে কি খুব অন্যায় করা হয়েছে? ওর আসল রাগ, আমি কেন মরলাম না, আমি কেন আবার ভালো হয়ে উঠলাম! বলতে বলতে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে শম্পার মা উঠে গেলেন।

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম, আমার আগেই শম্পা সব কথা শুনেছে। ভাবতে অবাক লাগল যে তারপরেও শম্পা আমাকে ওর সঙ্গী হতে বলছে। কিন্তু এটা শম্পার কোন্ ধরনের রাগ? ও কি ভাবে যে কলকাতায় না যেতে হলেই ও পরিত্রাণ পেত? এখানে মেয়েদের নামে কুৎসারটনার জন্যে বড়ো রকমের ঘটনা ঘটার প্রয়োজন হয় না, তা কি ও জানে না?

রাস্তায় বেরিয়ে সোজাসুজি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, মার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন কেন?

ও বললে, মনের জ্বালায়।

বললাম, আপনি কি ভাবেন কলকাতায় না যেতে হলেই আপনি পার পেয়ে যেতেন?

তাই কি আমি বলেছি?

তাহলে আপনার জ্বালাটা কিসের?

চকিতে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে ও তাকাল। চশমার কাঁচে রাস্তার আলো পড়ে চক্‌চক্‌ করছে। কিন্তু সেই চক্‌চকে কাঁচদুটোর ভেতর থেকেও কি কয়েকটা আলো-ঠিক্‌রনো ফোঁটা বেরিয়ে এল? নাকি আমার চোখের ভুল?

ও বললে, আপনি বুঝবেন না।

সেদিন সত্যিই বুঝিনি। কিন্তু আজ বুঝি। এখন মনে পড়ছে, কুৎসাবিদ্ধা হয়েও সেই বেণীসংবদ্ধকুন্তলা কালো মেয়েটি আগের মতোই আপিসে যাতায়াত করেছে, আগের মতোই মুখ উঁচু করে কথা বলেছে সবার সঙ্গে। আত্মবিশ্বাসে প্রখর অকম্প্র দীপশিখার মতো। সেদিন আমি সত্যিই বুঝিনি যে শম্পার নিজের দিক থেকে কোনো গ্লানি ছিল না, নিজের কথা ও ভাবেনি।

একটি ছোট ঘটনা মনে পড়ছে। দিন তিনেক পরে একদিন ওর আর গাঙ্গুলীর একসঙ্গে ডিউটি পড়েছিল। আট ঘণ্টা ডিউটি কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গাঙ্গুলী একবারও মুখ তুলে তাকাতে পারেনি।

ডিউটি শেষ হবার পরে শম্পা বললে, গাঙ্গুলীদা, চলুন বাড়ি ফিরবেন তো? গাঙ্গুলী বললে, আ-আ-আ…!

তারপর অনেক কষ্টে বললে, আমি এখন যাব না, আমার যেতে দেরি হবে। বলেই এক লাফে রাস্তায় পড়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল।

আগেই বলেছি, মেয়েদের নামে কুৎসা এখানে ঝোড়ো হাওয়ার মতো ছোটে। কিছু দিনের মধ্যেই চায়ের দোকানে, ক্যান্‌টিনে, গিন্নীদের দ্বিপ্রাহরিক মজলিশে, মহিলা সমিতির অনুষ্ঠানে বিশেষ সংবাদদাতাদের রিপোর্টের ওপর রসালো আলো-চনার ডালপালা গজাতে শুরু করল। শেষকালে কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখায় মিলে এমন একটা আকাশছোঁয়া রূপ নিলে যে আমার মনে হল অতঃপর এই ব্যাপারটাকে নিঃশব্দে সহ্য করা কাপুরুষতার লক্ষণ। কিছু একটা বলা বা করা আমার কর্তব্য।

গাঙ্গুলীকে একদিন আমার কোয়ার্টারে ডেকে পাঠালাম।

গাঙ্গুলী প্রথমে আসতে চায়নি। শেষপর্যন্ত এল কিন্তু এসেই আমার হাতে মস্ত একটা লেখা কাগজ দিয়ে বললে, দাদা আপনি আমাকে যা জিজ্ঞেস করবেন, সব প্রশ্নের জবাব এই কাগজে লেখা আছে।

আমার সব প্রশ্ন আগে থেকেই অনুমান করে নিল কি করে সে প্রশ্ন আমি আর গাঙ্গুলীকে করিনি।

এতদিন পরে সেই লেখার মূল বক্তব্যটুকু শুধু আমার মনে আছে, আর মনে আছে ভুল বাংলায় অজস্র বানান ভুল করে প্রায় এক পৃষ্ঠার এক চিঠি। গাঙ্গুলী জানিয়েছে যে সে আমাকে দাদার মতো ভক্তি করে এবং সে কোনো দিন আমার নামে বা শম্পার নামে কুৎসারটনা করেনি।

আমি তারপর তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে একটি নিরীহ কুমারী মেয়ের মান-সম্ভ্রম-ভবিষ্যৎ ছেলেখেলার জিনিস নয়। কিন্তু হঠাৎ সে উপুড় হয়ে আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল। আর সেই এক কথা: দাদা আমি কিছু বলিনি···দাদা আমি কিছু বলিনি···

অতি কষ্টে গাঙ্গুলীকে শান্ত করে, তারপর স্টোভ ধরিয়ে চা খাইয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলাম।

পর দিন সকালে আপিসের কাজে বেরোচ্ছি, হঠাৎ থানার দারোগা দলবলসমেত হাজির। বললে, আপনার একটা স্টেটমেন্ট নিতে এসেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসের স্টেটমেন্ট?

অভিজ্ঞের মতো একটু হেসে দারোগা বললে, আমাকে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনি কি আর বুঝতে পারেননি? কাল সন্ধেবেলা আপনি অপারেটর গাঙ্গুলীকে বাড়িতে ডেকে এনে মারধোর করেছেন আর চায়ের সঙ্গে বিষ খাইয়েছেন।

আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়েথাকতে দেখে তেমনি হেসে দারোগা আবার বললে, থাক্, ওসব অভিনয় আপনি পরে করবেন। কাল রাত দশটা থেকে গাঙ্গুলী রক্তবমি করতে শুরু করে, রাত বারোটার সময় ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে

হয়। দশ লাখ পেনিসিলিন দিতে হয়েছে। আজ এক্স্‌-রে করা হবে। আপনি সমস্তই জানেন, তবুও আপনাকে আবার জানালাম। এবার আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিন তো।

দারোগার কোন্ প্রশ্নের জবাবে কী বলেছিলাম তা আর এখন আমার মনে নেই। অনেকক্ষণ পরে সাত পৃষ্ঠার ঠাসা লেখা একটা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে দারোগা বললে, সই করুন।

বিনা বাক্যব্যয়ে আমি সই করেছিলাম। সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, পৃথিবীটা একটা নরক, এখানে ভালো বলে কোনো জিনিস নেই, এখানে ভালো হবার কোনো অর্থও হয় না। কী হবে আমার জেনে এই সাত পৃষ্ঠায় কী লেখা আছে?

তারপরের কয়েক দিনের ঘটনার একটা অস্পষ্ট ছবি মনে আছে শুধু।

মনে আছে, হাসপাতালে পরপর তিন দিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। কি ভিড়, কি ভিড়! সারা প্রোজেক্টের লোক গাঙ্গুলীকে দেখতে আসছে। আর আমি গেলেই চারদিক থেকে সমবেত চিৎকার: ওই যে! ওই যে! তবুও শেষপর্যন্ত গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হয়নি।

আর শম্পা? শম্পা আগের মতোই আপিসে যাতায়াত করছে। কিন্তু ওর মুখ থেকে কথা আর হাসি মুছে গিয়েছিল। ডিউটির সময়ে চা পর্যন্ত খেতে চাইত না।

শম্পার মা একদিন শুধু বলেছিলেন, আমি তো কারও সঙ্গে কোনো রকম শত্রুতা করেছি বলে মনে পড়ে না। তবে এভাবে লোকে পেছনে লেগেছে কেন?

সে-সময়ে আমি কার সঙ্গে কী কথা বলেছি, কি-ভাবে চলাফেরা করেছি, তা এখন আর অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারি না। আপিসের কাজ করে যেতাম কিন্তু কি-ভাবে যে করতাম জানি না।

বিরূপাক্ষর কথা মনে পড়ছে। একদিন হঠাৎ সন্ধের সময় হাজির, বিনা

ভূমিকায় বললে, তুই পুরুষমানুষ-না? তারপরে সাধ্যমতো আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। অপবাদে ভেঙে পড়লে চলবে না, পুরুষ-মানুষের মতো মাথা উঁচু করে চলতে হবে। এসব কথা। এসব কথা আমি নিজেও জানি, সুতরাং বিরূপাক্ষের মুখে শুনে খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। তবে বিরূপাক্ষের যে কথাটা সেদিন আমার মনের মধ্যে দাগ কেটে বসেছিল তা হচ্ছে আগাগোড়া ব্যাপারটিকে অত্যন্ত সহজভাবে অপবাদ বলে আখ্যা দেওয়া। কেরানি এবং বাবুরা যখন প্রচণ্ড উল্লাসে হাসপাতালে যাতায়াত করছেন এবং সর্বত্র নানা ধরনের রসালো গল্প বানিয়ে বলার প্রতিযোগিতা চলছে—তখন এই একটি লোক অত্যন্ত সহজেই বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে আগাগোড়া ঘটনাটা একটা অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। প্রশ্ন করেনি, যাচাই করতে যায়নি, নিজের সহজ বুদ্ধি দিয়েই বিশ্লেষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিল। পরে আমি টের পেয়েছি, বিরূপাক্ষ একা নয়, 'এ'-টাইপের বাসিন্দারা সাধারণত এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আরেকজনের কথা মনে পড়ছে। তিনি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, অর্থাৎ অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু তলায়। আমি আপিসের কাজে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, কাজ সেরে ফিরে আসছি, তিনি হঠাৎ ডাকলেন, শুনুন।

কাছে যেতেই তিনি দ্রুত স্বরে বললেন, আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো রকম সাহায্য হয় তো বলবেন।

আমি ঘাড় নাড়লাম।

একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, আমার কি মনে হয় জানেন, কোথাও আপনার বিরুদ্ধে একটা বড়ো রকমের চক্রান্ত আছে।

কথাগুলো এমন কিছু নয়। কিন্তু সেদিনকার সেই আবহাওয়ায় এই সামান্য কয়েকটি কথার কম মূল্য ছিল না। তাহলে, সুস্থ বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়।

শম্পাকে একদিন বলেছিলাম, আপনি কিছু দিনের ছুটি নিয়ে বাইরে চলে যান।

শম্পা জিজ্ঞেস করলে, কেন ?

আমি বললাম, এই মামলা শেষপর্যন্ত কোর্টে উঠবে। আর তখন আপনাকে নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি করবে। সে বড়ো বিশ্রী ব্যাপার।

শম্পা বললে, না ! আমি বাইরে যাব না।

শম্পার মা বললেন, এই মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওর কোথাও যাওয়া চলবে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

তিনি বললেন, মামলা শেষ হবার আগে ও যদি যায় তো ওকে যেতে হবে লুকিয়ে। লোকে বলবে, পালিয়ে গেল ! এটা আমাদের সবার পক্ষেই লজ্জা। অপবাদের কাছে এত সহজে মাথা নোয়াব কেন ? এবং কথাগুলো তিনি এত সহজে উচ্চারণ করেছিলেন যে আমি অবাক হয়েছিলাম।

প্রায় মাসখানেক ধরে গাঙ্গুলীর চিকিৎসা চলল। তারপর হাসপাতাল থেকে ছাড়ল ওকে। শেষদিকে আর উৎসাহীদের ভিড় ছিল না। একটু চেষ্টা করলেই হয়তো দেখা করতে পারতাম। কিন্তু আমারও আর দেখা করার প্রবৃত্তি ছিল না।

তারপরে একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। মামলার আগের দিন সন্ধায় বিরূপাক্ষ আমার কোয়ার্টারে এসেছিল সে-কথা আগে বলেছি। বিরূপাক্ষ চলে যাবার একটু পরেই মূর্তিমান বিস্ময়ের মতো হাজির হল গাঙ্গুলী। আমাকে কোনো প্রশ্ন করবার অবকাশ দিলে না। সেই আরেক দিনের মতো হঠাৎ উপুড় হয়ে আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

সেই দিনের কথা আমি জীবনে ভুলব না। গাঙ্গুলী কাঁদছে আর আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। পা দুটো পর্যন্ত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করিনি।

তারপরে একটু একটু করে গাঙ্গুলীর মুখে যে-কাহিনী শুনলাম তা অবিশ্বাস্যরকমের ভয়ংকর। এই কাহিনী বিশ্বাস করতে হলে ঠিক আমার মতো অবস্থায় এই নগরীতে আসতে হবে। যে-ঘটনা অন্য কোথাও ঘটে না তা এখানে ঘটে এমনি

একটা ধারণা গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা থেকে আমার হয়েছিল। তাই আমি সহজেই বিশ্বাস করেছিলাম।

গাঙ্গুলী সেদিন অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় ছিল। ভাঙা-ভাঙা টুকরো-টুকরো কথায় সেদিন ও যা বলেছিল তার থেকে মূল কাহিনীটা টেনে বার করলে অনেকটা এই রকম দাঁড়ায়। একদিন এ-পি-ও ওকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন যে ওর চাকরি এ-পি-ও পাকা করে দেবেন এবং ওকে ৮০—১৬০ গ্রেডে প্রমোশন দেবেন যদি ও এ-পি-ওর কথামতো একটা কাজ করে। কাজটা আর কিছুই নয়, আমার ও শম্পার নামে কুৎসাপ্রচার। তারপর তিনি শম্পার ও আমার মধ্যরাত্রির ট্রেন-ভ্রমণ কাহিনীকে কি-ভাবে বিকৃত করতে হবে তা ভালোভাবে শিখিয়ে দেন। আমি যেদিন ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তখন প্রথমে নিজের বুদ্ধিতে ও আসতে চায়নি, পরে এ-পি-ওর বুদ্ধিতে রাজী হয়েছে এবং আবার নিজের বুদ্ধিতে একটা চিঠি লিখে নিয়ে এসেছে। আমার কোয়ার্টার থেকে ফিরে যাবার পর গাঙ্গুলীর গলা দিয়ে রক্ত বেরুনো, হাসপাতালে যাওয়া, পুলিসের কাছে রিপোর্ট করা, সবই এ-পি-ওর পরিকল্পনা মতো। এমনকি গাঙ্গুলী পুলিসের কাছে নিজে কোনো বিবৃতি দেয়নি, অনেক আগে থেকেই একটা টাইপ-করা কাগজ তৈরি ছিল, সে শুধু একটা দস্তখত দিয়েছে।

এ পর্যন্ত এ-পি-ওর পরিকল্পনা মতো ঠিক ঠিক কাজ হয়েছে। কিন্তু আজ হঠাৎ এ-পি-ও গাঙ্গুলীকে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম করেছেন, সুধন্যাকে বিয়ে করতে হবে। তার ওপরে সিকিউরিটি অফিসার গাঙ্গুলীকে শাসিয়েছে যে সে যদি এ-পি-ওর কথামতো কাজ না করে তবে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। গাঙ্গুলী তো চোখের ওপরেই দেখছে, একজনের হাতে হাতকড়া পরাবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে আনা হয়েছে এবং গাঙ্গুলী যদি কথামতো না চলে তবে মিথ্যা মামলা সাজানোর দায়ে তারও একই হাল করে ছাড়বে।

গাঙ্গুলী অন্য সমস্ত কথা শুনতে রাজী ছিল কিন্তু বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী নয়। আবার এ-পি-ও অন্য অনেক ব্যাপারে আপস করতে রাজী ছিলেন কিন্তু

এই একটি ব্যাপারে এক পাও পিছোতে রাজী নন।

আমি ভেবে দেখব, বলে গাঙ্গুলী এ-পি-ওর ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসেছে।

একদিন অনন্তকে কাঁদতে দেখেছিলাম আর আজ গাঙ্গুলীকে কাঁদতে দেখছি। পুরুষরা যে এভাবে কাঁদতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

কাঁদতে কাঁদতে গাঙ্গুলী বললে, দাদা, সারা প্রোজেক্টের কাছে আপনাকে ছোট করে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পাপ করেছি। পাপের বোঝা আর বাড়াব না। কি করলে মামলা মিটে যায় তাই বলুন।

গাঙ্গুলী ছিল এই মামলার ফরিয়াদি। সে যদি মামলা প্রত্যাহার করতে চায় তাহলে ঠেকাবে কে ?

প্রথম শুনানীর দিনেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেল।



এ-পি-ও, জেনারেল ম্যানেজারের সেক্রেটারি আর সিকিউরিটি অফিসার—এই তিনজনে নিজেদের বলেন 'ট্রায়ো'। অন্যরা বলেন ত্রিরত্ন। এই ত্রিরত্নের প্রথম দুটি রত্নের পরিচয় দিয়েছি, তৃতীয়টির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এই তৃতীয় রত্নটি এত বেশি স্বপ্রকট যে এখানকার কারও কাছে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার হয় না। আপনি যদি নতুন লোক হন তবে এক নম্বর ব্যারিয়ার গেট দিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এই রত্নের অদৃশ্য খপ্পরে পড়বেন; আপনি টের পাবেন না কিন্তু আপনার খাওয়া বসা চলার হুবহু বিবরণ এই রত্নের খাতায় প্রতিদিন নোট হতে থাকবে।

এই মামলা চলার সময়ে ত্রিরত্ন রোজ একবার করে হাসপাতালে যেতেন। সাধারণের দেখাসাক্ষাতের সময়ে নয়, সকালের দিকে কিংবা সন্ধের পরে। সিকিউরিটি অফিসার রোজ গাঙ্গুলীকে তালিম দিতেন, কোন্ কথার উত্তরে কী বলতে হবে, কোন্ কোন্ কথার স্পষ্ট জবাব এড়িয়ে চলতে হবে, ইত্যাদি। কিন্তু এত কাণ্ড করেও যখন শেষপর্যন্ত মামলা ফেঁসে গেল তখন তিনি হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার অনেক পথই খোলা ছিল, কিন্তু যে পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন তা অতি ভয়ংকর। সে ঘটনা পরে বলছি।

এখানে চাকরি নিয়ে আমার প্রথম কিছুদিনের মধ্যেই একটা নতুন অভিজ্ঞতা

হয়েছিল। চিঠিপত্র সবসময়ে ঠিকমতো পৌঁছয় না। বাইরের ঠিকানায় যে-সব চিঠি যায় বা বাইরে থেকে যে-সব চিঠি আসে—উভয় গতিপথেই কোথায় যেন একটা রূঢ় হস্তক্ষেপ আছে। বিশেষ করে খামের চিঠির ওপর। যাদের চিঠি নিয়ে কোনো গোলমাল হয় না, প্রত্যেকটি চিঠি অবারিত গতি, সংখ্যায় তারা খুবই কম। হাতে গোনা যায়। মজদুরপাড়া, কারিগরপাড়া, কেরানিপাড়া ও বাবুপাড়ার তো কথাই ওঠে না, এমনকি সাহেবপাডাতেও সবাই এই ভাগ্যবান দলভুক্ত নন।

শম্পার বাবা কিছু দিনের জন্যে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। এখানে থাকার সময়েই কলকাতায় বাড়িওলার সঙ্গে তাঁর বহুদিনের মামলার একটা তারিখ পড়ে। এখান থেকেই তিনি তাঁর উকিলের কাছে পরপর দুটো চিঠি লেখেন। দুটোই খামের চিঠি এবং চিঠিতে কতকগুলো অত্যন্ত জরুরী খবর দিয়ে মামলার তারিখ পিছিয়ে নিতে বলেছিলেন। এই দুটো চিঠির একটিও শেষপর্যন্ত উকিলের হাতে পৌঁছয়নি। ফলে ভদ্রলোককে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। ভদ্রলোক বাইরে থেকে নতুন এসেছেন, এখানকার হালচাল জানেন না, বা জানলেও তিনি তো আর এখানে চাকরি করেন না যে সব জেনে শুনেও চুপ করে থাকবেন—অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি সোজা পোস্টমাস্টারের কাছে হাজির।

পয়সা খরচ করে খাম কিনে চিঠি লেখা হয়, সে-চিঠি যায় না কেন ?

চিঠি ? পোস্টমাস্টার একেবার আকাশ থেকে পড়লেন।

হ্যাঁ, চিঠি ! আপনার নামে আমি কমপ্লেন করব।

ও ! চূড়ান্ত জবাব দেবার ভঙ্গিতে এই একটি মাত্র স্বরবর্ণ উচ্চারণ করে পোস্টমাস্টার চুপ করে রইলেন। মনে হয় ভদ্রলোককে বহুবার এ-ধরনের প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হয় এবং মুখে কিছু বলতে পারেন না বলেই হয়তো প্রত্যেকবারেই এমনি শিবনেত্র হয়ে সমস্ত জবাব এড়িয়ে যান।

ডাকের চিঠির ওপর ডাকবিভাগ ছাড়াও অন্য এক বিভাগের খবরদারির কথা ওয়াকিবহাল মাত্রই জানেন। সেটা কোনো নতুন কথা নয়। কিন্তু এখানে

নতুন কথা হচ্ছে এই : এখানে যাঁরা খবরদারি করে তাদের একেবারে মালিকানা স্বত্ব। প্রেমপত্রই হোক বা চাকরির দরখাস্তই হোক, কোন্‌টার যে কি গতি হবে তা কেউ বলতে পারে না। সুস্মিতা চ্যাটার্জির বিয়ে হয়েছিল হাওড়ার একটি ছেলের সঙ্গে। বিয়ের আগের থেকেই দুজনের জানাশোনা এবং চিঠি লেখালেখিও। ছ-মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে একটি করে লেখা চিঠি যে কোন্‌ অতল গহ্বরের দিকে মহাযাত্রা করেছিল তার কোনো হদিশই পাওয়া যায়নি। শেষপর্যন্ত ওরা দুজনেই রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি লিখতে শুরু করে।

এই মেয়েটিও কোমরে আঁচল জড়িয়ে পোস্টমাস্টারের কাছে গিয়েছিল।

আমার একটি চিঠিও যায় না, একটি চিঠিও পাইনে, কী ব্যাপার বলুন তো মাস্টারমশাই ?

চিঠি ? পোস্টমাস্টারের তেমনি চোখ-কপালে-তোলা ভাব।

পোস্টমাস্টার ভদ্রলোকটি মধ্যবয়সী, হাসিখুশি অমায়িক। অন্য সব ব্যাপারে সাধারণের সুবিধে-অসুবিধের দিকে তাঁর সাগ্রহ নজর। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে তিনি কেমন যেন একটা বোকা-বোকা ভাব করেন, মনে হয় যেন ইচ্ছে করে অ-বাক্‌ হন।

অবশ্য এই ভদ্রলোকের তো চাকরির দায়, অ-বাক না হয়ে উপায় কি তাঁর ? কিন্তু যারা এই ব্যাপারে ভুক্তভোগী, পয়সা খরচ করে চিঠি লিখেও অনিশ্চয়তার মধ্যে যাদের দিন কাটে, যাদের আত্মীয় স্বজনেরা জরুরী খবর দিয়ে চিঠি লিখেও কোনো জবাব পায় না এবং যাদের অন্তত ডাকবিভাগের ব্যাপারে কোনো চাকরির দায় নেই—তারাও এই ব্যাপারে আশ্চর্য রকমের অ-বাক্‌! সব জেনে শুনেও না-জানার ভান করে। যে খবর লেখবার জন্যে একটা খামের চিঠিই যথেষ্ট তা পরপর ছটা পোস্টকার্ডে লিখে পাঠায়। ডাকবিভাগের এই সর্বভুকটির পোস্টকার্ডে অপেক্ষাকৃত কম আসক্তি, বহু দিনের অভিজ্ঞতায় সবাই এইটুকু জেনে নিয়েছে।

বন্দীশিবির থেকে আত্মীয়স্বজনের কাছে লেখা ডেটিনিউদের চিঠি সেন্সরের

কাঁচিতে কিভাবে বিকৃত হয়, তার কিছু কিছু নিদর্শন সংবাদপত্রে পাওয়া গেছে। এই প্রোজেক্ট্কে চাকরিজীবীদের 'স্বর্গরাজ্য' বলা হয়। এখানে বন্দীশিবিরের মতো কাঁটাতারের বেড়াজাল নেই, সেন্সরের কাঁচিও অদৃশ্য। কিন্তু ডেটিনিউ-দের চিঠি বিকৃত হয়েও শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছয় বা না পৌঁছলেও সেন্সর কর্তৃপক্ষের নোট পাওয়া যায় যে অমুক চিঠি আটক করা হয়েছে—আর এই কাঁটাতারবিহীন অ-সেন্সসের স্বর্গরাজ্যে চিঠিপত্র লোপাট হয়ে যায় একেবারে। দশচক্রে ভগবান ভূত হবার কথা আছে, কিন্তু তাও একটা কিছু হওয়া। এখানে কত চক্র আছে কে জানে, কাগজে লেখা চিঠিরও নিশ্চিহ্ন নিরবশেষ মোক্ষলাভ।

অ্যাকাউন্টস্-এর এক বুড়ো কেরানি বলে, পি-ও তে এস-ও লেগেছে। পি-ও মানে পোস্ট আফিস আর এস-ও মানে সিকিউরিটি অফিসার।

এই সিকিউরিটির পুলিসের আসল কাজ, রেলওয়ে সম্পত্তি দেখাশোনা করা। ওআচ অ্যাণ্ড ওআর্ড। একমাত্র এই কাজের জন্যেই এই বিভাগটি মঞ্জুরীকৃত। পকেটমার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সন্দেহজনক পর্যন্ত সকলের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব পশ্চিমবাংলা পুলিস-বিভাগের এবং এজন্যে পশ্চিমবাংলা পুলিসের বিরাট একটি ঘাঁটিও আছে। এখানেও একজন সার্কেল ইন্‌সপেক্টরের অধীনে জনকয়েক ইন্‌সপেক্টর, এস্-আই ইত্যাদি ধাপে ধাপে নেমে গেছে।

ফলে এখানে এক অদ্ভুত অবস্থা। যে-কোনো ব্যাপারে সিকিউরিটি পুলিস আর পশ্চিমবাংলা পুলিস একসঙ্গে শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসে। এই যৌথ তাড়নায় চুরি-ডাকাতি-খুনখারাবি যে বন্ধ হয়েছে তা নয়। পায়ের জুতো থেকে গোয়ালের গোরু পর্যন্ত এখানে চুরি হচ্ছে, কিন্তু চোর ধরবার বা চুরি বন্ধ করবার দায় যে কারও আছে তা মনে হয় না। একাধিক ডাকাতি হয়েছে, ডাকাতি হবার পর-দিন সিকিউরিটি অফিসার একসঙ্গে অনেকগুলি ট্রাঙ্ককল করেই দায়িত্বমুক্ত হন; বেঙ্গল পুলিস কি করে তা টের পাওয়া যায় না।

এখানে শেষ ডাকাতি হয়েছে হাসপাতালের কাছে একটি 'সি'-টাইপ কোয়া-

ট´ারে। এক সালংকারা নববধূ কিছু দিনের জন্তে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, নববধূর অলংকারপ্রাচুর্য ডাকাতদলের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মাঝরাত্রে ডাকাতের দল আশেপাশের অন্য সমস্ত কোয়ার্ট´ারের সদর ও খিড়কির দরজা তার দিয়ে বেঁধে এই কোয়ার্ট´ারে ঢোকে। এতটুকু তাড়াহুড়ো করেনি। মাত্র পরনের কাপড়টুকু বাদ দিয়ে একটা গোটা বাড়ির মালপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে মাথায় করে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবুও ধরা পড়েনি। প্রোজেক্টের রাস্তায় নয়, ব্যারিয়ার গেটেও নয়। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, এতগুলো কোয়ার্ট´ারের সদর ও খিড়কির দরজা তার জড়িয়ে বন্ধ করেছে, তাতে সময়ও বড়ো কম লাগেনি, কিন্তু তবুও সিকিউরিটি পুলিস বা পশ্চিমবাংলা পুলিস কারও নজরে পড়েনি। অথচ এমনিতে রাত দশটার পরে কারিগরপাড়া থেকে কেরানিপাড়ায় যেতে হলে অন্তত বার তিনেক পুলিসের হাতে পড়তে হয়। শুধু পরিচয়পত্র দেখিয়েই রেহাই নেই, গন্তব্যস্থল সম্পর্কেও হাজার রকম কৈফিয়ত চাই।

মাঝে একবার সিকিউরিটি অফিসারের উর্বর মস্তিষ্কে পরিকল্পনা এসেছিল যে 'এ' ও 'বি' টাইপ কোয়ার্ট´ারের পরিবারের সকলকে আপন আপন পরিচয়পত্র মাদুলির মতো গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। কৈফিয়ত হিসাবে বলা হয়েছিল যে সারা প্রোজেক্টে দিনে রাতে কোনো সময়েই যেন ফালতু লোক ঘুরে বেড়াতে না পারে সেজন্তে এই ব্যবস্থা। শেষপর্যন্ত সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের সামনে এই ব্যবস্থা নাকচ হয়ে যায়। সিকিউরিটি অফিসারের এত সব উর্বর পরিকল্পনার একাংশও যদি নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্তে প্রযুক্ত হয় তাহলে অনেকের মনে নিশ্চিন্ত রাত্রিযাপনের আশ্বাস আসে।

এই ডাকাতির পরদিন সিকিউরিটি অফিসার টেলিফোন একস্‌চেঞ্জে এসে একাধিক ট্রাঙ্ককল করলেন। একটা কলের পরে পরবর্তী কলের জন্তে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছেন সেই সুযোগে একজন টেলিফোন অপারেটর বলেছিল, আমরা বড়ো ভয় পেয়ে গেছি স্যার।

'স্যার' হুংকার ছাড়লেন, কেন?

আমতা আমতা করে টেলিফোন অপারেটর বললে, এত ঘন ঘন ডাকাতি হচ্ছে, কবে কার বাড়িতে হয়, এই ভয় !

রক্তচক্ষু মেলে 'স্যার' জিজ্ঞেস করলেন, আপনি খবরের কাগজ পড়েন ?

ডাকাতির ভয়ের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ার কী সম্পর্ক থাকতে পারে বুঝতে না পেরে টেলিফোন অপারেটরটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

'স্যার' বললেন, খবরের কাগজে দেখেন না, কলকাতায় দিনেদুপুরে রোজ একটা করে ডাকাতি হচ্ছে ? ক-টা কেস্ ধরা পড়ে ?

টেলিফোন অপারেটরটিকে স্বীকার করতে হল, কোনো কেস্ ধরা পড়েছে বলে শোনা যায়নি।

খুশি হয়ে দরাজ গলায় হেসে উঠে 'স্যার' বললেন, এখানে তো আপনাদের ডবল সিকিউরিটি। বেঙ্গল পুলিস আছে, তার ওপরে আমরা আছি। চোরডাকাত ধরা তো আর আমাদের কাজ নয়, আমরা শুধু প্রোজেক্টের সম্পত্তি পাহারা দেব। তবুও দেখছেন তো আমরা চুপ করে বসে থাকি না।

এই চুপ-করে-বসে-না-থাকা আর ডবল সিকিউরিটির ঠেলা যে কী তা হাড়ে হাড়ে টের পায় সবাই। খবরের কাগজের হকারদের সব সময়ে আতঙ্ক, সিকিউরিটি পুলিসের এক রিপোর্টে যে-কোনো দিন প্রোজেক্টে ঢোকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। খবরের কাগজের হকাররা নাকি 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকার ভাঁজে ভাঁজে 'স্বাধীনতা' নিয়ে আসে। সুতরাং সিকিউরিটি পুলিসের সদাসতর্ক তৎপরতা। যখন-তখন হকারদের সাইকেল থামিয়ে কাগজপত্র লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে ডবল সিকিউরিটির দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে, এ-ঘটনা হামেসা চোখে পড়বে।

বইয়ের দোকানে 'সোভিয়েট লিটারেচার', 'নিউ টাইমস্' বা এ-ধরনের পত্রিকা পাওয়া যায় না। আগে থেকে পয়সা জমা দিয়ে অর্ডার দিলেও নয়। বইয়ের দোকানে গিয়ে যদি কেউ এসব পত্রিকার খোঁজ করে তবে দোকানদার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আর লোকটি বেরিয়ে গেলে দোকানদারকে আপন মনে মন্তব্য করতে শোনা যায়, শালা টিক্‌টিকি !

অর্থাৎ সাদাপোশাকী গোয়েন্দারা সবসময়ে বইয়ের ওপর নজর রাখছে আর মাঝে মাঝে নিজেরাই খদ্দের সেজে খোঁজ করে যায়, আপত্তিকর বইপত্র দোকানে আছে কিনা।

এমন কি 'ব্লিৎস' পত্রিকার পাঠকদেরও রেহাই নেই। এমন ঘটনাও শোনা গেছে যে সিকিউরিটি অফিসার নিজে এসে দোকানদারদের কাছে 'ব্লিৎস' পত্রিকার ক্রেতাদের নাম জানতে চেয়েছেন। ফলে 'ব্লিৎস' পত্রিকার বিক্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বাবুপাড়ার বাজারে একটি বইয়ের স্টল আছে। এই স্টলের মালিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। অনেক ঘাটের জল খেয়ে তিনি এখানে এসে ঠেকেছেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, কথাবার্তা বলেন খুবই কম, কিন্তু আলাপ করলে বোঝা যায় বই ও পত্রিকাজগতের খুঁটিনাটি খবর রাখেন।

আমি তাঁকে একদিন বলেছিলাম, আপনি এখানে পড়ে আছেন কেন?

একটু হেসে তিনি বলেছিলেন, আমার কপাল!

কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি। এই রকম জায়গাতেও বইয়ের স্টল করবার সাহস যাঁর আছে তিনি আর যাই হোন অদৃষ্টবাদী কিছুতেই হতে পারেন না। পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে এবং একটু একটু করে অনেক কথাই জেনেছি। ভদ্রলোক প্রথম এ-অঞ্চলে আসেন 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা'র এজেন্সি নিয়ে। তখন সবেমাত্র এই নগরীর পত্তন হচ্ছে এবং খুব একটা বড়ো রকমের আশা নিয়েই তিনি এসেছিলেন। তখনো বাজার-স্টল হয়নি, তিনি রেলস্টেশনে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা ফেরি করে বেড়াতেন।

একদিন পত্রিকা নিয়ে প্রোজেক্টের ভেতরে ঢুকছেন, হঠাৎ সিকিউরিটি পুলিস পথ আটকাল, বললে, হুকুম নেই!

জানা গেল, মানুষটিকে ঢুকতে দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা নিয়ে ঢোকা চলবে না। কাগজে-কলমে কিছু নয়, সিকিউরিটি অফিসারের মৌখিক আদেশ।

আচ্ছা বেশ। বলে তিনি অবিক্রীত পত্রিকার বোঝা নিয়ে ফিরে গেলেন। পরদিন স্টেশনে পত্রিকা ফেরি করতে করতে স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, সাদা-পোশাকী গোয়েন্দারা তাঁর ওপরে নজর রাখছে। এবং এটুকুও বুঝতে পারলেন, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার ক্রেতাদের চিনে রাখাই এই গোয়েন্দাদলের উদ্দেশ্য। সেদিন তিনি ইচ্ছে করেই একটিও পত্রিকা বিক্রি করলেন না, অবিক্রীত পত্রিকার বোঝা নিয়ে সেদিনও ফিরে গেলেন।

পরদিন ভোরবেলা সিকিউরিটি অফিসার নিজেই এসে হাজির। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা যারা কেনে তাদের প্রত্যেককে চিনিয়ে দিতে হবে।

ভদ্রলোক বললেন, হুজুর আমি তো সকলের চোখের ওপরেই পত্রিকা বিক্রি করছি, আপনার লোকজনদের আরেকটু কড়া নজর রাখতে বলুন, তারা নিজেরাই চিনে নিতে পারবে।

কড়া নজর রাখার দিক থেকে অবশ্য কোনো রকম ফাঁক ছিল না, কিন্তু তবু সেদিনও পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার একজন ক্রেতাকেও চেনা যায়নি।

এদিকে ভদ্রলোক করেন কি, সকালবেলা লোক-দেখানো-গোছের কিছুক্ষণ ফেরি করে এসেই সারাদিন বসে বসে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাকে ছোট ছোট প্যাকেটে ভাঁজ করেন। তারপর বাচ্চা একটি ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে একেকবারে চার-পাঁচটা প্যাকেট কোমরে গুঁজে দিয়ে পাঠিয়ে দেন প্রোজেক্টের ভেতরে। ছেলেটি লাট্টু ঘোরাতে ঘোরাতে আর লারে-লাপ্পা গান গাইতে গাইতে বাড়ি বাড়ি সেই প্যাকেট ফেলে দিয়ে আসে।

এভাবেই শুরু। তারপরে শেষপর্যন্ত তিনি এই প্রোজেক্টে স্টল পেয়েছেন, দোকান সাজিয়েও বসে আছেন, এবং আজও খোঁজ করলে স্টেট্সম্যান পত্রিকা ও দু-একটা সিনেমা-মাসিক ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রতিদিন অজস্র ছোট ছোট প্যাকেট বিলি হয়।

একদিন আমাকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা বলুন তো সোভিয়েট লিটারেচার কত কপি বিক্রি হয়?

আমার ধারণা ছিল প্রকাশ্যে বিক্রি হতে কোনো বাধা না থাকলেও এই পত্রিকা এক কপিও বিক্রি হবে না। আমি বললাম, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

আমাকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, পঁচিশ কপি সোভিয়েট লিটারেচার বিক্রি করি।

তারপরে তিনি আমাকে একটা লম্বা ফিরিস্তি দেখালেন। কোন্ পত্রিকা কত বিক্রি হয় তার হিসেব।

হাসতে হাসতে বলেছিলাম, আপনি তো কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন।

তিনি বললেন, কমিউনিজ্‌ম্ কী আমি জানি না। কিন্তু দু-একজন কমিউনিস্টকে দেখেছি। তাদের মতো হতে পারাটা সহজ কথা নয়।

এমন আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি কথাগুলো বললেন যে আমাকে চুপ করে থাকতে হল।

কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন, আপনি একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, আমি কেন এখানে পড়ে আছি। কেন পড়ে আছি জানেন? সিকিউরিটি অফিসারকে আমি একবার দেখিয়ে দিতে চাই ক্ষমতার জোরে পৃথিবীর নিয়ম ওল্‌টানো যায় না। যতোদিন বেঁচে থাকব, সিকিউরিটি অফিসারের নাকের ওপর বসে আমি এভাবে পত্রিকা বিক্রি করব।

কারিগরপাড়ার এক চায়ের দোকানে 'সত্যযুগ' রাখা হত। সিকিউরিটি বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী একদিন সেখানে চা খেতে খেতে মন্তব্য করলেন, বাপু হে, ব্যবসা করতে বসেছ ব্যবসা করো। রাজনীতির দিকে ঝোঁক কেন?

দোকানদাব কিছু বুঝতে না পেরে বললে, আজ্ঞে।

শেষপর্যন্ত জানা গেল, সত্যযুগ পত্রিকা রাখার অর্থই নাকি রাজনীতির দিকে ঝোঁক।

স্থানীয় লাইব্রেরির এক গানের আসরে বাইরের একজন গায়ক আই-পি-টি-এর যুদ্ধবিরোধী গান গেয়েছিল। আতঙ্কিত হয়ে সিকিউরিটি অফিসার মস্ত এক

কন্‌ফিডেনশিয়াল রিপোর্ট দিয়েছিলেন। এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের ওপর বেশ কিছুদিন ধরে কড়া নজর রাখা হয়েছিল। এই ঘটনায় সিকিউরিটি ডিপার্টমেণ্ট এত বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয় যে একজন সিকিউরিটি ইন্‌স্‌পেক্‌টরকে মদের ঝোঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল : আরে মশাই, পালিত বুড়োর লোকেরা সব এখানে চাকরি করতে এসেছে।

'পালিত বুড়ো' মানে কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো।

চোরডাকাত ধরা পড়ে না। মোটরের পার্টস্‌ থেকে শুরু করে মশারি টাঙাবার দড়ি পর্যন্ত অনেক কিছুই স্টোর্স থেকে উধাও হয়ে যায়। ঠিকাদারের লরী বিনা লাইসেন্সে যাতায়াত করে। অনেক ব্যাপারেই সিকিউরিটি বিভাগ অন্ধ, অনেক কিছু দেখেও দেখে না। কিন্তু সম্পূর্ণ এক অধিকার বহির্ভূত এলাকায় সাড়ম্বর কর্মতৎপরতা ; টিকটিকির পোকা ধরার মতো অতন্দ্র ও অখণ্ড মনোযোগে চোখ পেতে অপেক্ষা করছে। সুযোগ পেলেই লোলজিহ্বা প্রসারিত করে চেপে ধরে। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ-ধাঁধানো কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট ও ব্যস্ত-ত্রস্ত ছুটোছুটির চমক। কলকাতার পুলিস যেমন মাঝে মাঝে দল বেঁধে পেটি-কেস ধরতে বেরোয় এবং হাতের কাছে নিরীহ গোছের যাদের পায় ধরে এনে কোটাপূরণ করে—তেমনি সিকিউরিটি বিভাগও মাঝে মাঝে 'পালিত বুড়োর লোক' আবিষ্কার করে চলেছে। আর এই হচ্ছে ডবল সিকিউরিটি।

সিকিউরিটি বিভাগের এই 'চুপ-করে-বসে-না-থাকার' ও 'ডবল সিকিউরিটি'র আরো বহু নমুনা আছে। সন্ধের পরে দল বেঁধে সবুজ পাহাড়ে বেড়াতে গেলে সিকিউরিটি পুলিসের নজরে পড়তে হয়। কয়েকজনে মিলে একটা হাতেলেখা পত্রিকা প্রকাশ করলে সিকিউরিটি পুলিস পেছনে লাগে। নিজের খুশিমতো আবৃত্তি-গান-অভিনয় করার কোনো সুযোগ তো এমনিতেই নেই ; কিন্তু অপরের খুশিমতো আবৃত্তি গান অভিনয় না করলেও বিপদ। ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এক ভদ্রলোক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেননি বলে কৈফিয়ত তলব করে অফিসারের চিঠি আসে। জবাবে ভদ্রলোক অসুস্থতার অজুহাত

দেন। শেষকালে সিকিউরিটি পুলিসের রিপোর্ট থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে ভদ্রলোক নাকি সেদিন কিছুমাত্র অসুস্থ ছিলেন না।

আমার মনে আছে, একদিন সাহেবপাড়ার ওভ্যালের কাছে দাঁড়িয়ে ওভারহেড লাইনের কাজ দেখছি, এমন সময়ে হঠাৎ স-ল্যাণ্ডরোভার সিকিউরিটি অফিসারের আবির্ভাব।

আচ্ছা, টেলিফোন পোস্টের মাঝামাঝি ওই যে চৌকো চৌকো বাক্স—ওগুলো কী? সিকিউরিটি অফিসারের প্রশ্ন।

আমি জবাব দিলাম, প্রোটেক্টেড্ কেব্ল্ টার্মিনাল বক্স্।

কথাগুলোকে পুরোপুরি উচ্চারণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সিকিউরিটি অফিসার আবার বললেন, ওগুলো ওখানে কেন?

আমি যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম। ওই যে মাটির তলা থেকে জি-আই পাইপ উঠেছে ওর মধ্যে টেলিফোনের কেব্ল্ আছে। কেব্লকে ওঠানো হয়েছে চৌকো বাক্স পর্যন্ত। তারপর কেব্লকে চিরে ছিটিয়ে জোড়া জোড়া তার বার করে কতকগুলো টার্মিনাল পয়েন্ট-এ লাগানো হয়েছে। আবার এই টার্মিনাল পয়েন্ট থেকে চারদিকে ওভারহেড তার টানবার ব্যবস্থা। সিকিউরিটি অফিসার কী বুঝলেন তিনিই জানেন, আগাগোড়া মন দিয়ে শুনে মন্তব্য করলেন, আপনার যা ব্যবস্থা দেখছি এতে তো স্যাবোটাজের খুব সুবিধে!

জি-আই পাইপের ভেতর দিয়ে টেলিফোনের কেব্লকে মাত্র ছ-ফুট ওপরে টেনে তুললেই কি করে স্যাবোটাজের সুবিধে হয় তা বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে রইলাম।

সিকিউরিটি অফিসার বললেন, আপনার একাজ ঠিক হয়নি। কেব্ল্কে মাটির ওপরে তোলবার দরকার কি? আগাগোড়া মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যান। বুঝছেন? ঘাড় নেড়ে জানাতে হল, বুঝেছি। এই অর্বাচীনকে কি করে বোঝাব যে তার কথামতো কাজ করতে হলে টেলি-কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-শাস্ত্রকেই পাল্টে ফেলতে হয়?

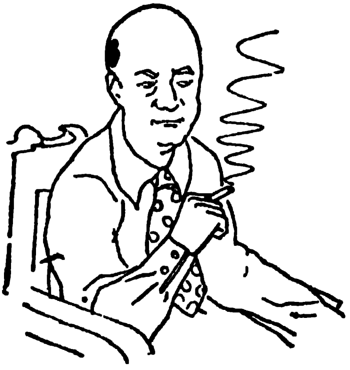
একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে। টেলিফোন ডিপার্টমেণ্টে তিন মাসের জন্যে একটি স্টোর-কীপারের পদ মঞ্জুর হয়েছিল। তিন মাসের চোদ্দ দিন বাকি থাকতে স্টোর-কীপারের নামে ছাঁটাইয়ের নোটিশ আসতে এতটুকু ভুল হল না। কিন্তু তিন মাসের পর তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করেও স্টোর-কীপার ভদ্রলোক প্রাপ্য মাইনে পেলেন না, যদিও কাগজে কলমে নিয়ম আছে যে সেট্‌লমেণ্ট বিল তিন দিনের মধ্যে মঞ্জুর করে দিতে হবে। শেষকালে ভদ্রলোক একদিন আমার কাছে এসে বললেন, আমি আর অপেক্ষা করে কি করব, চলে যাই। মাইনে যা পাব তা তো এই তিন সপ্তাহ বসে খেতে গিয়েই প্রায় সব শেষ করে এনেছি। এর পর ধার রেখে যেতে হবে। ভদ্রলোক সরাসরি পাকিস্তানে চলে যাবেন, ঠিকানা দিয়ে গেলেও এখান থেকে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠানো চলবে না। সুতরাং যেতে হলে মাইনের আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েই যেতে হয়। আমি তখন ভদ্রলোককে একটা পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তাতে কাজ হয়েছিল।

সেই দিনই একটা 'স্বাধীনতা' পত্রিকা হাতে নিয়ে সোজা সিকিউরিটি অফিসারের কাছে গিয়ে হাজির। বললেন, স্যার, আমার একজন বন্ধু এখানে বেড়াতে আসবে। তিন দিনের জন্যে একটা পারমিট স্লিপ চাই।

স্বাধীনতা পত্রিকার দিকে চোখ পড়তেই সিকিউরিটি অফিসার আঁতকে উঠলেন। বললেন, আপনার এবং আপনার বন্ধুর নামধাম রেখে যান আমি বিবেচনা করে দেখব।

দু-ঘণ্টার মধ্যে ভদ্রলোকের বাড়িতে দুজন লোক গিয়ে হাজির। একজন সিকিউরিটি বিভাগের, অপরজন পে আপিসের। দু-জনের হাতে দুটি চিঠি। একটি চিঠিতে জানানো হয়েছে যে ভদ্রলোককে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রোজেক্ট ছেড়ে চলে যেতে হবে, অপরটিতে জানানো হয়েছে যে ভদ্রলোকের মাইনের বিল মঞ্জুর হয়েছে, আজকের মধ্যেই যেন নিয়ে নেন।

সর্বাধিপতি



জেনারেল ম্যানেজারের কথা না বললে এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এখানে ক্ষুদে অফিসারদের পর্যন্ত এমন দাপট যেন বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারেন। কিন্তু প্রোজেক্টের জেনারেল ম্যানেজারকে চোখে দেখতে পাওয়াই প্রায় একটা বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার। তিনি আপিসে আসেন ঠিক দশটায় আর ঠিক একটায় লাঞ্চে যান, তারপর আবার তিনটে থেকে পাঁচটা। অর্থাৎ তিনি চারবার যাতায়াত করেন এবং এই চারবারই অ্যাড্‌মিনিসট্রেটিভ বিল্‌ডিং-এর প্রধান সিঁড়ি দিয়ে লোক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। একবার এক ভদ্রলোক জেনারেল ম্যানেজারের কামরার পেছন দিকের করিডরে দাঁড়িয়ে কাঁচের জানলার ভেতর দিয়ে জেনারেল ম্যানেজারকে একবার চোখের দেখা দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে চাপরাশিকে চার্জশীট খেতে হয়েছিল। তার অপরাধ, সে কেন নজর রেখে ভদ্রলোককে আটকায়নি।

বছরের মধ্যে তিন দিন জেনারেল ম্যানেজারকে সামনা-সামনি দেখা চলতে পারে। ২৬শে জানুআরি, ১৫ই অগস্ট, ২রা অক্টোবর। এই তিন দিন তিনি সবুজ পাহাড়ের মাথায় তিনরঙা ঝাণ্ডা উড়িয়ে বক্তৃতা করেন। ষোলো মাসের মধ্যে আমি নিজে একবার মাত্র জেনারেল ম্যানেজারকে দেখেছি। মনে হয়েছিল, যাঁকে নিয়ে প্রোজেক্টে এত আলাপ-আলোচনা, যাঁর সম্পর্কে এত গল্প, তাঁর চেহারাটা যেন সেই অনুপাতে মানানসই নয়। কালো লম্বা চেহারা, খুব

কম কথা বলেন, খুব সাধারণ সাজপোশাক। সঙ্গের চাপরাশিকে না দেখলে অনেক সময়ে তাঁকে জেনারেল ম্যানেজার বলে চেনা যায় না!

কিন্তু জেনারেল ম্যানেজারকে ভালোভাবে চিনতে হলে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। সংক্ষেপে বলছি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী একবার এখানে এসেছিলেন সে-কথা আগেই বলেছি। তাঁর গলায় মালা দিয়েছিল কারখানার একজন প্রৌঢ় ফিটার মিস্ত্রী। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা গ্রেডের সেমি-স্কীল্‌ড্‌ কর্মচারী, ডেলি-রেট খালাসী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে বিশ বছরের চেষ্টায় উন্নতির শেষ ধাপে পৌঁচেছে। মালা পরাতে গিয়ে লোকটি থর থর করে কাঁপছিল।

প্রধানমন্ত্রীকে মাল্যভূষিত করবে কোনো অফিসার-দুহিতা নয়, একজন সাধারণ শ্রমিক—এই পরিকল্পনা জেনারেল ম্যানেজারের। এই জেনারেল ম্যানেজারের আদেশেই এখানকার নগণ্যতম কর্মচারীর বদলির খবরও সরকারী বুলেটিনে সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়। প্রকাণ্ড গাড়ি চালিয়ে আপিসে যাবার সময় হঠাৎ হয়তো একদিন আপিসযাত্রী কেরানীদের মধ্যে দু-একজনকে অযাচিতভাবে লিফট দিয়ে দেন। হয়তো একদল ছেলে ইস্কুলে যাচ্ছে, পাশ দিয়ে যেতে যেতে কি খেয়ালবশে ছেলের দলকে ঠাসাঠাসি করে গাড়ির মধ্যে পুরে স্কুলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন। জেনারেল ম্যানেজারের গাড়ি থেকে নেমে ফ্যাকাশেমুখ সেই সব ছেলের দল অন্তত দুটো পিরিয়ড ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকে।

প্রোজেক্টে নির্মাণকার্যের গোড়ার দিকে ছ-নম্বর রাস্তার সাব-স্টেশনটি যখন সবে তৈরি হচ্ছিল সে-সময়ে একদিন হঠাৎ বিকেলের দিকে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে এই ভদ্রলোক সেই নির্মীয়মাণ সাব-স্টেশনটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পরনে হাফপ্যাণ্ট, হাফশার্ট, হাতে বার্ক্‌লে সিগারেট, ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ছাদ-পেটার কাজ হচ্ছে বুঝি? ছাদের ওপর থেকে রাজমিস্ত্রী জবাব দিলে, হ্যাঁ। কিন্তু বাবু একটু সরে যান, ময়লা জল ছিটে

গিয়ে গায়ে লাগবে। ভদ্রলোক আস্তে এক পা মাত্র সরে গিয়ে আবার তেমনি ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে রইলেন। রাজমিস্ত্রী এবার একটু রাগত-স্বরে বললে, কথা বলছি কানে যাচ্ছে না বুঝি? তারপর সত্যি সত্যিই খানিকটা ময়লা জল ছিটকে এসে ভদ্রলোকের গায়ে লাগল। একটি কথা না বলে তিনি চলে গেলেন।

ভদ্রলোক চলে যাবার একটু পরেই ছুটতে ছুটতে সুপারভাইজার এসে হাজির। দূর থেকেই ব্যাপারটা তার চোখে পড়েছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, সাহেব নিচে দাঁড়িয়ে কি বলছিলেন রে?

সাহেব আবার কে এল? রাজমিস্ত্রী বিরক্ত হয়।

ভদ্রলোকের পরিচয় শুনে রাজমিস্ত্রী তো একেবারে থ। ভেবেছিল এখানকার পাট উঠিয়ে এবারে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য, তিন দিন পার হয়ে যাবার পরেও এ-সম্পর্কে কোনো রকম উচ্চবাচ্য হল না! চার দিনের দিন রাজমিস্ত্রী গদগদ হয়ে সুপারভাইজারকে বললে, যাই, বলেন, জি-এম সাহেবের মতো মানুষ হয় না!

এই একই কথা কারিগরপাড়ার একজন 'বি'-টাইপ কর্মচারীরও। ভদ্রলোক নতুন চাকরি নিয়ে এসেছেন। স্টোরে চাকরি, সুতরাং অ্যাড্‌মিনিসট্রেটিভ আপিসের সাহেবদের চাক্ষুস দেখার সুযোগ ঘটেনি। হঠাৎ একদিন সন্ধের পর এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এলেন। পরনে হাফপ্যাণ্ট, হাফশার্ট, হাতে বার্ক্‌লে সিগারেট।

একথা সেকথার পর আগন্তুক ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেরো-সিনের বাতি ব্যবহার করছেন কেন? ইলেকট্রিক কানেক্‌শন পাননি?

'বি'-টাইপ ভদ্রলোক অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন, আর বলেন কেন মশাই? সাত দিন ধরে চার্জম্যানের আপিসে ঘোরাঘুরি করছি। এখনো বাবুদের কানেক্‌শন দেবার সময় হল না। হত 'ডি'-টাইপ কি বাংলো, তাহলে একবার দেখে নিতাম।

আগন্তুক বললেন, হুঁ!

'বি'-টাইপ বলে চললেন, শুধু কি ইলেকট্রিক কানেক্শন? এখনো কলের জল খুলে দিয়ে যায়নি। পাশের কোয়ার্টার থেকে জল নিয়ে আসি। জলের জন্যে রোজ একবার তাগাদা দিয়ে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে আগন্তুক ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সদর পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গৃহস্বামী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় কাজ করেন মশাই?

আমি? ভদ্রলোক হাসলেন, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আপিসে কাজ করি।

পরদিন ভোরবেলা কাকপক্ষী জাগতে না জাগতে এই 'বি' টাইপ কোয়ার্টারে ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, টাউন ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বড়ো বড়ো অফিসারের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক কানেক্শন, কলের জল, ইত্যাদি। তারপরে দিন সাতেক এই ভদ্রলোকও তটস্থ অবস্থায় দিন কাটিয়েছিলেন, আট দিনের দিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, সত্যি, জি-এম সাহেবের মতো মানুষ হয় না!

জি-এম সাহেবের মতো মানুষ হয় না, একথা বলে অ্যাকাউন্টস্-এর সেই কেরানি ছোকরাটিও, মিটিং-এ বক্তৃতা করার অপরাধে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রোগা কালো ছেলেটি, সব কথার শেষেই খুব মিষ্টি করে হাসে, খুবই নিরীহ, খুবই গোবেচারা চেহারা। কিন্তু এই ছেলেটিই মিটিং-এর আগের দিন কারখানার গেটে সিকিউরিটি অফিসারের সমস্ত রিজার্ভ ফৌজের উদ্যত রাইফেলের মুখে বুক টান করে দাঁড়িয়েছিল। একবারও কাঁপেনি।

এখানে রাইফেলের চেয়েও জেনারেল ম্যানেজারের ভ্রূকুটি বেশি ভয়ের ব্যাপার। সেই সব-চেয়ে-বেশি ভয়ের ব্যাপারটাও আগেই ঘটেছিল। জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে ও ঢুকেছিল স্টেনোর ঘরের ভেতর দিয়ে পেছন দিককার কর্মচারীদের ঢোকবার দরজা দিয়ে নয়, সেক্রেটারির ঘরের ভেতর দিয়ে ডানদিককার অফিসারদের ঢোকবার দরজা দিয়েও নয়, বিশিষ্ট বহিরাগতদের জন্যে নির্দিষ্ট

সামনের দরজা দিয়ে। সেই সবচেয়ে ভয়ের ভ্রূকুটির সামনেও তেমনি হেসে শেষ কথা বলে এসেছে: ইউনিয়নকে স্বীকার করে নিতেই হবে! দু-একজন কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্তের ভয় দেখিয়ে ইউনিয়নকে রোখা যাবে না। এত বড়ো শিল্প-নগরী, হাজার হাজার শ্রমিক যেখানে কাজ করে, যেখানে অধিকাংশ শ্রমিককে প্রথম কয়েক বছর ডেলি-রেটে কাজ করতে হয়েছিল এবং আজও যেখানে অধিকাংশ শ্রমিকের চাকরি অস্থায়ী—সেখানে একটিও স্বীকৃত ইউনিয়ন নেই, এই আশ্চর্য অবস্থার একমাত্র কৃতিত্ব জি-এম সাহেবের। জি-এম সাহেবের মতো মানুষ হয় না!

শুধু তাই নয়। নিজের খাস-কামরায় ইউনিয়ন সংগঠকদের ডেকে ধমক দেবার স্পর্ধাও এখনো এই ভদ্রলোকের আছে। সারা প্রোজেক্টে রাইফেলধারী সিকিউরিটি প্রহরীকে জীবন্ত একটা ধমকের মতো উদ্যত করে রেখেছেন যেন কোথাও কেউ ফিসফাস আলোচনা না করে, কোথাও কোনো সভাসমিতির প্রস্তুতি না হয়। এই সীমাহীন দাপটের কাছে শ্রমিকদের সভাসমিতি সম্পর্কে সরকারী সার্কুলার পর্যন্ত মর্যাদা পায় না।

মে-দিবসে প্রোজেক্টের ভেতরে একটা সভা করবার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। সরকারী সার্কুলার আছে, মে-দিবসে শ্রমিকদের সভা-অনুষ্ঠানে সর্বক্ষেত্রে অনুমতি দিতে হবে, এমনকি বিশেষ ক্ষেত্রে কারখানার ভেতরে এই সভা হতে পারে। কিন্তু দু-সপ্তাহ আগে আবেদন করা সত্ত্বেও এবং সপ্তাহখানেক অনেক ঘোরাঘুরি করেও মে-দিবসের আগের দিন পর্যন্ত কিছুতেই জানা যায়নি, এই সভার অনুমতি দেওয়া হবে কিনা। শেষপর্যন্ত অবশ্য অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। কারখানা ছুটি হবার মাত্র দু-ঘণ্টা আগে জানানো হয় যে কারখানা থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে বাবুপাড়ার প্রান্তে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। তিন মাইল বড়ো কথা নয়; কিন্তু মজদুরপাড়ায় নয়, কারিগরপাড়ায় নয়, বাবুপাড়াতেও নয়, সাহেবপাড়া ও বাবুপাড়ার মাঝখানে নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ডের মতো গার্ল স্কুলের যে মাঠ—সেই মাঠকে সভার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়ে উদ্যোক্তাদের সমস্ত পরিকল্পনাকে

বানচাল করার চেষ্টা হয়েছিল। অথচ এখানে সভা করার মতো ফাঁকা জায়গার অভাব নেই। কারখানার দু-পাশে পোড়ো জমির মতো ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে। এমনকি টাইম আপিসের গেটের সামনেও হাজার তিনেক লোকের একটা মিটিং অনায়াসে হতে পারে। তাছাড়া, মাত্র দু-ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কারখানার সমস্ত শেডে সভার খবর পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তবুও সভা হয়েছে। লালঝাণ্ডা উড়িয়ে অল্প যে কয়েকজন শ্রমিক সেদিন মে-দিবসের শপথ গ্রহণ করেছিলেন তা ঘটনা হিসেবে বড়ো না হতে পারে, কিন্তু মস্ত একটা সম্ভাবনা হিসেবে স্মরণীয়। সভায় তেমন জনসমাবেশ হয়নি কিন্তু এই সভার ঘোষণা কারখানার শেডে শেডে নতুন এক আশ্বাসের বাণী পৌঁছে দিয়েছিল।

অ্যাকাউন্টস্-এর সেই কেরানি ছেলেটি বলে, ওরা ভয় পেয়েছে। তাই ওদের এত চালাকি, এত ষড়যন্ত্র!

চালাকি আর ষড়যন্ত্রের প্রলেপ দিয়ে সরকারী হিসেবের বড়ো-বড়ো ফাঁক হয়তো ঢাকা যেতে পারে কিন্তু শ্রমিকের শ্রেণী-দৃষ্টিকে অন্ধ করা যায় না। এখানে প্রথম এসে সবচেয়ে বড়ো যে ধাপ্পায় মুগ্ধ হতে হয় তা হচ্ছে এখানকার কোয়ার্টার। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের শ্রমিকের জন্যেও এমন সুন্দর দু-কামরাওলা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোয়ার্টার—অন্য কোথাও চোখে পড়বে না। কিন্তু এই ধাপ্পা বেশি দিন টেকে না। বছরের পর বছর যেখানে ডেলি-রেটে কাজ করতে হয়, অফিসারের মর্জির ওপরে যেখানে চাকরির স্থিরতা, চলতে ফিরতে পদে পদে যেখানে সিকিউরিটি পুলিসের হয়রানি—সেখানে ভালো কোয়ার্টারের ব্যবস্থাটা যে মস্ত একটা ধাপ্পা তা বুঝতে দেরি হবার কথা নয়। এবং এই অভাবনীয় ব্যবস্থার পেছনে যে বিরাট একটা ষড়যন্ত্রও আছে তাও ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করা যায়। 'এ'-টাইপ কোয়ার্টারের *বিন্যাস এবং সিকিউরিটি পুলিস* ও থানার ঘাঁটিগুলোর অবস্থান এমনভাবে করা হয়েছে যাতে মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র শ্রমিক-অঞ্চলকে প্রোজেক্ট থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ফেলা চলতে পারে।

'এ'-টাইপ কোয়ার্টারে নবজাতকের আবির্ভাব হলে সে-খবর বড়ো বড়ো হরফে

সরকারী বুলেটিনে ছাপা হয় কিন্তু 'এ'-টাইপ কোয়ার্টারে নবাগত পরিচিত জনের আবির্ভাব হলে সিকিউরিটি পুলিসের খাতায় লাল কালিতে ঢেরা পড়ে। ১৫ই অগস্ট ও ২৬শে জানুআরি তারিখে সবুজ পাহাড়ে জেনারেল ম্যানেজারের বক্তৃতা শোনবার জন্যে একমাস আগে থেকে সরকারী খরচে বড়ো বড়ো সার্কুলার জারি হয় কিন্তু সে-দিবসের সমাবেশের জন্যে একটি পোস্টার আঁটতে গেলে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে ছ-নম্বর আইটেম চিহ্নিত চার্জশীট আসে।

সুতরাং শ্রমিকদের মোহমুক্ত হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ধাপ্পা দিয়ে বা চোখ রাঙিয়ে যে শ্রমিক সংগঠনের পথ আটকানো যায় না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। প্রোজেক্টে মিটিং করতে দেবে না? আচ্ছা, কাজলপুরের মাঠ আছে। বাইরের লোককে প্রোজেক্টে ঢুকতে দেবে না? আচ্ছা, রেললাইনের ধার দিয়ে দিয়ে এক মাইল পথ চার মাইল ঘুরিয়ে শ্রমিকনেতাদের নিয়ে আসা হবে। সিকিউরিটি পুলিসের খাতায় নাম উঠবে? কত বড়ো খাতা ওদের আছে যে গোটা প্রোজেক্টের প্রত্যেকটি শ্রমিক-কর্মচারীর নাম আলাদা আলাদা করে টুকে রাখবে?

ইতিহাসের গতি



সেদিন ছিল রবিবার, কারখানা ছুটি। বিকেল চারটে থেকেই কারিগর পাড়ার বড়ো রাস্তায় পদধ্বনি জাগল। একজনের নয়, দু-জনের নয়, যেন ভবিষ্যৎ ইতিহাস পায়ে পায়ে পথ করে চলেছে। সেই বিরাট জনতাকে পার হতে দেবার জন্যে তিন নম্বর ব্যারিয়ার গেট খুলে দিতে হয়েছিল। ব্যারিয়ার গেটের একপাশে পথচারীদের জন্যে সরু ঘোরানো রাস্তা, এদিক-ওদিক পাশ কাটিয়ে মাঠ ডিঙিয়ে শর্টকাটের অভাব নেই—কিন্তু তবুও খুলে গেল ব্যারিয়ার গেট। ইতিহাসের গতি বড় সড়ক দিয়েই চলে, শর্টকাট তার জন্যে নয়। ব্যারিয়ার গেটের একপাশে সিকিউরিটি ইন্‌স্‌পেক্টর সাদা পোশাকে দাঁড়িয়েছিলেন, একজন শ্রমিক হঠাৎ তার সামনে গিয়ে বলে, কি কমরেড, দাঁড়িয়ে কেন?

সিকিউরিটি ইন্‌স্‌পেটর একেবারে আঁতকে ওঠেন। সা'ব নয়, স্যার নয়, কমরেড! ভূত দেখার মতো দু-পা পিছিয়ে যান, তারপর ব্যারিয়ার গেটের প্রহরীর জন্যে নির্দিষ্ট ছাউনির মধ্যে ঢুকে উত্তেজিত স্বরে টেলিফোন করতে শুরু করেন।

প্রায় দু-হাজার শ্রমিক জড়ো হয়েছিল সেই সভায়। বাইরে থেকে দুজন শ্রমিক নেতা এসেছিলেন। বার্নপুরের একজন শ্রমিক বলে, মাত্র দু-বছর আগে বার্নপুরে আমাদেরও কারখানা-এলাকার বাইরে গিয়ে মিটিং করতে হত। মাত্র

দু-বছর! আর আজ ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে সঙ্গে না নিয়ে কারখানার ম্যানেজার শ্রমিক-অঞ্চল পরিদর্শনে যেতে সাহস পান না।

শ্রমিক নেতাদের মধ্যে একজন বললেন, দশ বছর আমি ইংরেজের কারাগারে কাটিয়েছি, দু-বছর স্বাধীন ভারতের কারাগারে। কিন্তু কারাগারের মধ্যেও কোনো ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে আমরা এক-জন প্রতিনিধি মনোনয়ন করতাম এবং আমাদের সেই প্রতিনিধিকে কর্তৃপক্ষ মেনে নিতেন। ব্যারাকের মধ্যেও আমরা সভা করেছি, ঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিল বার করেছি। কিন্তু স্বাধীন ভারতের এই প্রথম শিল্প-প্রচেষ্টার সরকারী নাম যাই হোক, একে কারাগার বললেও সম্মান দেওয়া হয়—বলা উচিত, কন্‌সেন্‌-ট্রেশন ক্যাম্প। বন্দীশিবির!

সেই সভায় বক্তৃতা দিয়েছিল টুলরুমের চার্জম্যান, হেভি মেশিন শপের ফিটার মিস্ত্রী, ওয়েলডিং শপের খালাসী। শেষ বক্তৃতা অ্যাকাউন্টস্‌-এর সেই কেরানি ছেলেটির। আর তারপর শ্লোগান। শ্লোগানের ঢেউ কাঁপতে কাঁপতে মাঠ প্রান্তর ডিঙিয়ে প্রোজেক্টের 'এ'-টাইপ 'বি'-টাইপ কোয়ার্টার পার হয়ে সাহেব-পাড়ার বাংলোগুলোকে থর থর করে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এবার আর অহল্যার কান্না নয়, কালবৈশাখীর ঝড় যেন ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছে। টেলিফোন আর ইলেকট্রিক তারে বাতাসের ধাক্কা লেগে নাকি এই ধরনের শব্দ হয়। বাড়ির ছাদের ওপর আটশো পাউণ্ডের ইলেকট্রিক তার এমনিতে স্থির অনড়, কিন্তু এক-বার কাঁপতে শুরু করলে সহজে থামে না। তখন মনে হয় যেন গোটা বাড়িটাই কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেদিন সন্ধ্যায় এমনি এক ঘরবাড়ি-কাঁপানো ঝড় উঠেছিল।

সন্ধ্যার পর প্রকাণ্ড একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বালানো হল। দু-হাজার শ্রমিকের সেই সভার পক্ষে একটি বাতি যথেষ্ট নয়। মনে হচ্ছিল, খুবই সংকীর্ণ একটা পরিধিতে বাতির আলো পড়েছে। কিন্তু হঠাৎ একবার দপ করে বাতিটা নিভে যেতেই গভীর এক অন্ধকার-সমুদ্রে তলিয়ে গেল সভাস্থল। শেষ সারির

যে-লোকটির আভাস এতক্ষণ টের পাওয়া যাচ্ছিল সেও আর নেই। তখন বোঝা গেল, বাতির আলো যতোটুকু স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ ততোটুকুতেই শেষ নয়, তার বাইরেও সেই আলো শেষ সারির শেষ মানুষটিকেও অন্ধকার থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে।

গাঢ় অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্ করে একজন আরেকজনকে বললে, কমরেড, কি মনে হচ্ছে জানো ?

কি ?

আমাদের এই সভা ঠিক যেন এই বাতিটার মতো। যারা আজকে এই সভায় নেই তাদের কাছেও এই আলোর খবরও পৌছবে।

বড়ো রাস্তা দিয়ে জোরালো হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা ল্যাণ্ডরোভার প্রোজেক্টের দিকে যাচ্ছিল। কোনো অফিসার বোধহয়। জংশন শহর থেকে ফিরছেন। একটা বাঁক ঘুরতেই ল্যাণ্ডরোভারের আলো সভার ওপরে এসে পড়ল। দু-হাজার মুষ্টিবদ্ধ হাত আর একটা লাল ঝাণ্ডা! উল্‌টো দিক থেকে কোনো গাড়ি আসছিল তা নয়, তবুও ল্যাণ্ডরোভারের বাতিদুটো নিভিয়ে দেওয়া হল হঠাৎ।

ল্যাণ্ডরোভারের বাতি নিবে গিয়েছিল। কিন্তু নিবে যাওয়া বাতিরও একটা বার্তা আছে। সে বার্তা অন্ধকারের, আতঙ্কের। এই অন্ধকার ও আতঙ্ক দিয়ে গড়া এক কুৎসিত দানবীয় মূর্তি কিছু দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড এক প্রতিহিংসায় জেগে উঠল।

সেদিন ছিল শনিবার। সোয়া এগারোটায় কারখানার ছুটির ভোঁ বেজেছে। দলে দলে শ্রমিক বেরিয়ে আসছে টাইম আপিসের গেট দিয়ে। এমন সময়ে হঠাৎ একদল সেপাই একটি শ্রমিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কাঁহা ভাগ্‌তা শালা।

মার ভালো শালা চোরকো!

অন্য শ্রমিকরা ভালো করে ব্যাপারটা বুঝে ওঠবার আগেই বেটন আর রাই-

ফেলের কুঁদো দিয়ে মারতে মারতে লোকটিকে তারা আধমরা করে ফেলেছে। গোটা কারখানার শ্রমিক দাঁড়িয়ে পড়েছে ততোক্ষণে। ইচ্ছে করলে সেই বিরাট জনতা দুজন সেপাইকে ছারপোকার মতো টিপে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তা তারা করেনি।

একদল যায় আহত শ্রমিকটিকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে, অপর দল কৈফিয়ত দাবি করে।

মারলে কেন?

একজন সেপাই বলে, দেখছ না, কারখানার মাল বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কী মাল সরিয়েছে দেখি?

খানিকটা জুট। জুট মানে চট নয়, ছেঁড়া টুকরো সুতোর তালগোল পাকানো একটা বাণ্ডিল। যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করবার জন্যে এগুলোর ব্যবহার। তেল-কালির কাজ যাদের বেশি, তাদেরও হাত পরিষ্কার করবার জন্যে খানিকটা জুট দেওয়া হয়। সেই জুট্।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে সিকিউরিটি অফিসার এসে হাজির হয়েছেন। সমুদ্রের মতো উদ্বেল সেই জনতার দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দিতে হল, এই অন্যায়ের প্রতিবিধান তিনি করবেন।

শ্রমিকরা বললে, সোমবারের মধ্যে এই ব্যাপারের হেস্তনেস্ত চাই।

মাঝখানে রবিবার, তারপরে সোমবার। যথারীতি ছ'টায়, পৌনে সাতটায় কারখানার ভোঁ বাজল। যথারীতি শ্রমিকরা কারখানায় ঢুকে টিকিট পাঞ্চ করলে। তারপরেই এক আশ্চর্য ব্যাপার। একজন শ্রমিকও মেশিনে হাত দিল না। আগে শনিবারের জবাব চাই, তারপরে কারখানা চালু হবে।

স্মিদি শপের বড়ো বড়ো স্টীমহ্যামারগুলো স্থির অনড় হয়ে আছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ জ্বালা করে আর তারপর মনে হয় রুদ্ধ এক শক্তির আবেগে হ্যামারগুলো যেন কাঁপছে। হঠাৎ ইচ্ছে হয়, হ্যামারগুলো নেমে আসুক, প্রচণ্ড গতিতে বজ্রপাতের মতো নেমে আসুক, থর থর করে কেঁপে উঠুক

আশেপাশের মাটি। কিন্তু তবুও নেমে আসে না। একটিমাত্র সুইচ, যা টিপলেই নেমে আসতে পারত, সেই সুইচ টিপবার লোকটি উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে। আগে শনিবারের জবাব চাই।

ফোরম্যানরা আস্তে আস্তে সরে পড়ল। ওআর্কস-ম্যানেজাররা দূর থেকে একবার টহল দিয়েই আর এল না। জেনারেল ম্যানেজার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বড়ো বড়ো অফিসাররা অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেটিভ আপিসে বসে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। আর শেডে শেডে শ্রমিকরা মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। শনিবারের জবাব চাই।

এইভাবে চলল দশটা পর্যন্ত।

কোনো কোনো শেড থেকে গানের শব্দ ভেসে আসছে। কোরাস গান নয়। দু-একজন গুনগুন করে গাইতে শুরু করেছিল, হঠাৎ সেই সরু-মোটা বিভিন্ন গলার বিভিন্ন গান একসঙ্গে মিলে গেছে যেন। এ-গানের ভাষা নেই, কিন্তু সুর আছে। ঐকতান নয়, শব্দের ঘোষণা; ইরেকটিং শপের ক্রেন্‌চলার ঘড়্‌ঘড় শব্দের সঙ্গে স্মিদিশপের হ্যামারের ধুপ্‌ধাপ মিশে যে ঘোষণা তৈরি হয়। দশটার পর লালঝাণ্ডা উড়ল কারখানার আকাশে। আগে যেখানে পলাশ ফুলের গাছ ছিল, লাল পলাশে আগুন ধরে যেত যেখানকার আকাশে আর এখনো যেখানে আয়রন ফাউণ্ড্রির চিমনি থেকে আগুনের আভা বেরিয়ে লাল রঙের ছোপ ধরে —ঠিক সেইখানটিতে। গাঢ় নীল আকাশের গায়ে লাল তারার মতো ফুটে রইল যেন।

কিন্তু তবুও তারা নয়। হঠাৎ নড়ে উঠেছে, এগিয়ে আসছে। তারপরেই হাজারকণ্ঠকাঁপানো স্লোগান। জবাব চাই। গোটা কারখানার শ্রমিক লালঝাণ্ডা উড়িয়ে সার বেঁধে অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেটিভ আপিসের দিকে এগিয়ে আসছে। জবাব চাই।

অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেটিভ আপিস আর কারখানার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা গেট। সেখানে এসে দেখা হল দু-দলে। একদিকে হাজার হাজার মুষ্টিবদ্ধ হাত,

আরেকদিকে উত্তোলিত রাইফেল। একদিকে শ্লোগান, অন্যদিকে আর্তনাদ। একদিকে সংকল্প, অন্যদিকে আতঙ্ক।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে মিছিল। থর থর করে কাঁপছে রাইফেলগুলো। বিবর্ণ পাংশু মুখে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অফিসাররা। আসছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে মিছিল। শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র হয়ে এগিয়ে এলেন একজন জুনিয়ার অফিসার। রাইফেল সরিয়ে নেওয়া হল।

জুনিয়ার অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই তোমাদের?

জবাব চাই!

আহত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, দোষী সেপাইদের শাস্তিদিতে হবে, কারখানা থেকে পুলিস-সেপাই সরিয়ে নিতে হবে, ইউনিয়নকে স্বীকার করতে হবে।

জবাব নিয়ে জুনিয়ার অফিসার ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে আবার বললেন, জেনারেল ম্যানেজার বিবেচনা করে দেখছেন, সময় দিতে হবে।

শ্রমিকরা সময় দিতে রাজী হল।

পরদিন কাজলপুরের মাঠে মিটিং ডাকা হল আবার।

এবং সেই মিটিঙেই জবাব এল জেনারেল ম্যানেজারের। চিলের মতো ছোঁ মেরে কারখানার তিনজন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পুলিস।

অ্যাকাউন্টস্-এর সেই ছেলেটি কয়েদী-ভ্যানে উঠতে উঠতে চিৎকার করে বললে, কমরেডস, ভুলবেন না, জবাব চাই!

জবাই চাই! আকাশসন্ধানী বনস্পতির মতো উদ্যত হল বজ্রমুষ্টি।

সাম্প্রতিক একটি ছাটাইয়ের ঘটনা উল্লেখ করে জেনারেল ম্যানেজারের কথা শেষ করছি।

লাইব্রেরির এক গানের আসরে আই-পি-টি-এর গান শুনে সিকিউরিটি অফিসার মস্ত এক কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সে-কথা আগেই বলেছি। তারপরেই জেনারেল ম্যানেজার এক সার্কুলার জারি করলেন। সার্কুলারে বলা

হল, অতঃপর লাইব্রেরির কর্মকর্তা নির্বাচিত হতে হলে অন্তত পনের বছরের পাকা চাকরি বা দেড়শো টাকা মূল বেতন হওয়া চাই। জেনারেল ম্যানেজারের সার্কুলার এই প্রোজেক্টে অলজ্ঘ্য। কিন্তু তবুও লাইব্রেরি সম্পর্কে এই বিশেষ সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রবল একটা প্রতিবাদের ঝড় উঠল। লাইব্রেরির গঠনতন্ত্রে আছে, একজন ক্লাস ওআন অফিসার লাইব্রেরির সভাপতি হবেন। এই বছর সভাপতি ছিলেন ডিসট্রিক্ট ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। সাধারণ সভ্যদের চাপে পড়ে অবশেষে তিনি সাধারণ সভা ডাকতে বাধ্য হলেন।

এই সভায় একটি কেরানি ছেলে বলেছিল: আমার মাইনে কোনোও কালে দেড়শো টাকা হবে না। তার মানে কি এই নয় যে অন্য সব রকমের যোগ্যতা থাকলেও আমি লাইব্রেরির কর্মকর্তা হতে পারি না?

সভাপতি জবাব দিয়েছিলেন: কেন নয়? পনের বছরের পাকা চাকরি হলেই পারেন।

পনের বছরের পাকা চাকরি! অনেক কাঠখড় পুড়লে তবে একজন কেরানির চাকরি পাকা হয়। তারপরেও পনের বছর। অর্থাৎ, প্রায় অবসর নেবার সময়ে সংসারদায়গ্রস্ত প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পার হয়ে তবে একজন কেরানি লাইব্রেরির কর্মকর্তা হবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

তারপর একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন ওঠে, যদি অধিকাংশ সভ্য এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে তাহলেও কি এই সার্কুলার কার্যকর করা হবে? সভাপতি জানালেন, সভা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে সুতরাং সভার কাজ মুলতুবী রাখা হল।

সভাপতি উঠে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সভ্যরা দাবি জানাল, সভা শেষ করে যেতে হবে। বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হল সভাপতিকে। তারপর কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারী মনোভাবের নিন্দে করে এবং জেনারেল ম্যানেজারের সার্কুলারের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল।

এই হচ্ছে ঘটনা।

তিন দিন পরে টের পাওয়া গেল এই ঘটনা কর্তৃপক্ষকে কতখানি আতঙ্কিত করেছে। তেরোজনের নামে ছ-নম্বর আইটেম চিহ্নিত চার্জশীট আসে, কয়েক-জনকে সাস্পেণ্ড করা হয়। অফিসারকে সরকারী কর্তব্যপালনে বাধাদান ও মারপিট, এই ছিল চার্জশীটের অভিযোগ।

লাইব্রেরির সাধারণ সভ্যদের সভায় সভাপতিত্ব করাটা আইনের কোন্ সূত্র অনুসারে সরকারী কর্তব্যপালন সেকথা অবশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি।

তারপরের কিছু দিনের কার্যকলাপ যবনিকার অন্তরালে। সিকিউরিটি ডিপার্ট-মেণ্টের বড়ো বড়ো অফিসাররা হন্যে হয়ে কলকাতার এস-বি ও আই-বি ডিপার্ট-মেণ্টে যাতায়াত শুরু করল। লম্বা লম্বা কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট তৈরি হল প্রত্যেকের নামে। এত সব তোড়জোড়ের পর মহাসমারোহে ঘোষণা করা হল যে অভিযুক্তদের বিচার করবার জন্যে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করা হবে। এই নিরপেক্ষ কমিটিতে ছিলেন তিনজন ক্লাস ওআন অফিসার।

অভিযুক্তদের মধ্যে একজন এই 'নিরপেক্ষ' কমিটিকে প্রশ্ন করেছিল :

আমাদের দোষী সাব্যস্ত করে চার্জশীট দিয়েছে কারা ?

'নিরপেক্ষ' কমিটির মুখপাত্র হয়ে ডি-জি-এম জবাব দেন, আমরা।

আমাদের বিচার করছে কারা ?

আমরা।

ফরিয়াদী বিচারকের আসনে বসেছে, এটা কোন্ দেশী বিচার ?

কমিটির মুখপাত্র এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি।

এমন অপূর্ব বিচারপদ্ধতি এই অপূর্ব নগরীতেই বোধ হয় সম্ভব।

অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে ডিস্‌ট্রিক্‌ট ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারকে প্রশ্ন করা হল :

আপনি বলছেন আপনাকে মারপিট করা হয়েছে—সাক্ষী আছে ?

তিনি জবাব দিলেন, না।

প্রশ্ন : যে তেরোজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে—তাদের প্রত্যেককে আপনি চেনেন ?

উত্তর : না

ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার অতঃপর আর কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হল, এই তেরোজনের প্রত্যেকেই যে সেদিনকার সভায় উপস্থিত ছিল, তার প্রমাণ কি ? কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। অভিযুক্তরা প্রশ্ন করেছিল, ঠিক এই তেরোজনই মারপিট করেছে, একজন বেশিও নয় বা কমও নয়, তার প্রমাণ কি ? কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে 'নিরপেক্ষ' কমিটির অধিবেশন বসে। কমিটির কোনো রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। কোন্ যুক্তিতে কমিটি অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেছে তাও জানা যায়নি। অভিযুক্ত তেরোজনের মধ্যে সাতজনকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়। বাকি ছ-জনকে ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ, পদাবনতি ইত্যাদি নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়। যে ছ-জন অভিযুক্তদের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল, তাদেরও পরে এই ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তাদের অপরাধ, সাক্ষী দেবার সময়ে তারা কর্তৃপক্ষের বিরূপ সমালোচনা করেছে।

কথামালার গল্পে আছে, বাঘ ছাগলকে বলছে—তুই জল ঘোলা না করে থাকিস, তোর বাবা করেছে। এই ঘটনাও আগাগোড়া এই জল-ঘোলা-করারই ব্যাপার। আসল কথা, যে-করে হোক্ কয়েকজন অনভিপ্রেত কর্মচারীকে ছাঁটাই করা। লাইব্রেরির ঘটনা না ঘটলে ফুটবল খেলায় অফিসারদের টীমকে ছুয়ো দেবার অপরাধেও এই একই ঘটনা ঘটতে পারত।

এই সাতজন বরখাস্ত কর্মচারীকে পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে কাজলপুরের মাঠে প্রকাণ্ড সভা হয়েছিল। কারিগরপাড়ার তিন নম্বর ব্যারিয়ার গেটকে ধাক্কা দিয়ে খুলে তেমনিভাবেই জনস্রোত এসেছিল এই সভায়। তেমনি স্লোগান, তেমনি আকাশসন্ধানী বনস্পতির মতো উদ্যত বজ্রমুষ্টি।

সিকিউরিটি অফিসার ও সিকিউরিটি পুলিস ঘিরে রেখেছিল সেই সভাটিকে। তবুও সিকিউরিটি অফিসারের ভ্রূকুটির নিচে দাঁড়িয়ে হাজার মানুষ এককণ্ঠে দাবি জানায় : ছাঁটাই কর্মচারীদের কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে। ইলেকট্রিক ডিপার্ট-

মেন্টের সেই আড়াই-শো কর্মচারীর মতো এবার আর প্রত্যেককে আলাদা আলাদা নোটিস দিয়ে প্রোজেক্ট থেকে বার করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বরং সেই হাজার মানুষ সভার শেষে মিছিল করে ফিরে এসেছিল ব্যারিয়ার গেট পর্যন্ত। মুখে একটিমাত্র শ্লোগান : ছাঁটাই কর্মচারীদের কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে! অফিসারস্ ক্লাবে সেদিন বিকেলে একটি নাচের আসর বসবার কথা ছিল। নাচ-ঘরের ঝাড়বাতিটা কেঁপে উঠেছিল শ্লোগানের ধাক্কায়।

সিকিউরিটি অফিসার দাঁড়িয়েছিলেন ব্যারিয়ার গেটের সামনে। সেই বিশাল জনতা উত্তাল একটা ঢেউয়ের মতো ল্যাণ্ডরোভার সমেত তাঁকে হয়তো একটা মোচার খোলার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেত— কিন্তু তার আগেই নিদারুণ আতঙ্কে পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে। সোজা গিয়ে উঠলেন সেণ্ট্রাল পাওয়ার হাউসে। আর একটু পরেই কারখানার সাইরেন গোঁ গোঁ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল। সকালে-দুপুরে-বিকেলে কাজে যোগ দেবার সময়ে বা টিফিনের সময়ে বা ছুটির সময়ে যে-ভাবে সাইরেন বেজে ওঠে—সেভাবে নয়। মোটা থেকে সরু আবার সরু থেকে মোটা—দ্রুত দীর্ঘস্থায়ী আবর্তন। কারখানায় যদি আগুন লাগে বা গুরুতর রকমের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে— একমাত্র তখনই এভাবে সাইরেন বাজে। তারপরেই সারা প্রোজেক্টে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। অফিসারস ক্লাবের নাচের আসর ছেড়ে অফিসাররা ছুটতে ছুটতে এসে চেপেছে ল্যাণ্ডরোভারে আর সারি সারি ল্যাণ্ডরোভার ছুটছে কারখানার দিকে। সিকিউরিটি ব্যারাক থেকে হুস্-হুস্ করে বেরিয়ে আসছে সাঁজোয়া গাড়ি। জরুরী অবস্থার সম্ভাবনায় ডাক্তাররা ছুটছে হাসপাতালের দিকে। আর সমস্ত কিছু ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে সেই শ্লোগান : ছাঁটাই কর্মচারীদের কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে!

হাজার কণ্ঠের এই প্রথম প্রতিবাদ আশ্চর্য এক সংগ্রামী চেতনা সৃষ্টি করেছিল! ছোটখাটো কয়েকটি ঘটনায় তার আভাস পাওয়া গেছে। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে আগুনের স্রোত নেমে আসার খবর পাওয়া যায় মাটির সামান্য একটু

কাঁপুনি থেকে বা অস্পষ্ট একটু আওয়াজে। তেমনি এই ছোটখাটো ঘটনাগুলোও হয়তো বৃহৎ এক অগ্ন্যুৎপাতের সূচনা।

আগেই বলেছি, এই প্রোজেক্টের বি-টাইপ কোয়ার্টারে পঁচিশ ওআটের বেশি পাওয়ারের বাতি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ছাত্রদের পক্ষে এই অস্পষ্ট আলোয় পড়াশুনো করা যে কী অসুবিধা সে-কথা অনেক চেষ্টা করেও কর্তৃপক্ষকে বোঝানো যায়নি। কিন্তু তার ওপরে হঠাৎ একদিন ঘোষণা করা হল যে রাত এগারোটার সময় বি-টাইপের বিজলী-সরবাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। কয়েকদিন আগে হলেও এই ঘোষণার জবাবে মাত্র দু-একজনের ব্যক্তিগত আবেদন-নিবেদন ছাড়া বড়ো রকমের কোনো ঘটনা ঘটত বলে মনে হয় না। কিন্তু সাতজন বরখাস্ত শ্রমিক সর্বস্বান্ত হয়ে পথে দাঁড়িয়ে এখানে এক নতুন হাওয়া সঞ্চারিত করে গেছে। সেই হাওয়া হঠাৎ ঝড় হয়ে ফেটে পড়ে। গোটা কারখানা ধর্মঘট করে বসে এই ঘোষণার প্রতিবাদে। তারপর এখানে এতদিন যা ছিল কল্পনাতীত তাই ঘটল। বি-টাইপের বিজলী-সরবরাহ সম্পর্কে সরকারী আদেশ বাতিল করে নতুন আদেশ প্রচারিত হল তিন ঘণ্টার মধ্যে।

এমনি আরেকটি ঘটনা ঘটেছে বাবুপাড়ার এক স্কুলমাস্টারকে নিয়ে। তিনি থাকতেন 'বি'টাইপ কোয়ার্টারে। তাঁর পাশের কোয়ার্টারে যিনি থাকতেন তিনি এই প্রোজেক্টের বিখ্যাত 'ত্রি-রত্নের' অনুগৃহীত ব্যক্তি। স্বভাবতই এই ভদ্রলোকের নজরটা ছিল উঁচু দিকে, একজন স্কুলমাস্টারের সঙ্গে পাশাপাশি থাকতে আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছিল তাঁর।

সুতরাং যে-কোনো লোককে অপদস্থ করতে হলে যে কাজটা সবচেয়ে সহজসাধ্য তাই শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ চরিত্রহীনতার বদনাম। আর চরিত্রহীনতার বদনাম এমনই একটা ব্যাপার যে তা শোনামাত্রই লোক বিশ্বাস করে, যাচাই করার দিকে কারও বিশেষ নজর থাকে না।

তারপরেই এক বাধ্যতামূলক আদেশপত্র। বাবুপাড়ার শেষ সীমানায় জন-বসতিহীন পরিত্যক্ত অঞ্চলে এক নির্মীয়মান কোয়ার্টারে উঠে যেতে হবে শিক্ষক-

মশাইকে। 'ত্রি-রত্নের' অনুগৃহীত ভদ্রলোক প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বেড়াতে থাকেন ; দেখে নেব মাস্টারকে?

কিন্তু শেষপর্যন্ত 'মাস্টারকে' 'দেখে' নেওয়া যায়নি। খবরটা ছড়াতে ছড়াতে সবেমাত্র একটা বিক্ষোভের আকার নিতে শুরু করেছে—তা টের পেয়েই অশেষ প্রভাবশালী 'ত্রি-রত্ন' ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে সাহস পায় না। বাধ্যতামূলক আদেশ বাতিল হয়ে যায়।

আরও আছে। কারখানায় টহল দিতে দিতে হঠাৎ একদিন এক ওআর্কস ম্যানেজার একজন মিস্ত্রীকে কি খেয়ালবশে হুকুম করে যে একটি অত্যন্ত জটিল যন্ত্রকে দশ মিনিটের মধ্যে চালু করতে হবে।

মিস্ত্রীটি বলে, হুজুর!

ওআর্কস ম্যানেজারের সেই এক কথা। দশ মিনিটের মধ্যে যন্ত্রটিকে চালু করতে হবে।

তখন মিস্ত্রীটি বলে, হুজুর, আমি হয়তো চেষ্টা করলে দশ মিনিটের মধ্যেই এই যন্ত্র চালু করতে পারি। কিন্তু আপনাকে আধঘণ্টা সময় দিলেও একাজ করতে পারবেন?

অফিসারের মুখের ওপর কথা! তাও যে-সে অফিসার নয়, খোদ ওআর্কস ম্যানেজার। সুতরাং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছয় নম্বর আইটেম চিহ্নিত একটি চার্জশীট।

ওআর্কস ম্যানেজারের স্বাক্ষর-দেওয়া এই ছয় নম্বর আইটেম চিহ্নিত চার্জশীট-টিকেও শেষপর্যন্ত বিনা শর্তে প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করেছিলেন, চার্জশীট প্রত্যাহার না করলে টুল-রুমে ধর্মঘট হতে পারে।

তারপরে অন্ধকার ও আতঙ্ক দিয়ে গড়া দানব-মূর্তিটি প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে উঠেছিল। পরের বছর প্রোজেক্টের ভেতরে মে-দিবসের সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সরকারী সার্কুলার থাকা সত্ত্বেও নয়। শুধু অনুমতি না-দেওয়া নয়। অফিসাররা প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বেড়িয়েছে যে, যে কেউ মে-দিবসের সভা করবার

চেষ্টা করবে তাকেই গ্রেপ্তার ও ছাঁটাইকরা হবে। রাইফেলধারী সিকিউরিটি পুলিস দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা টহল দিয়ে বেড়িয়েছে প্রোজেক্টের রাস্তায় রাস্তায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মে-দিবসের সভা হয়েছিল। প্রোজেক্টের সীমানার মধ্যে নয়। কাজলপুরের মাঠেও নয়। রেলস্টেশনের কাছে ইউনিয়ন আপিসে। রেললাইন ধরে পুবদিকে কিছুটা এগিয়ে এসে একটা মাটিলেপা বস্তির ঘর, জরাজীর্ণ অবস্থা। একপাশে বেড়ার গায়ে ছোট সাইনবোর্ড। এই হচ্ছে ইউনিয়নের আপিস।

মে-দিবসের সন্ধ্যায় এখানে দশ-বারোজন শ্রমিক জড়ো হয়েছিলেন। কারখানা-ছুটির পরে তিন মাইল পথ হেঁটে এসেছে সবাই। পরনে তেলকালিমাখা হাফপ্যাণ্ট ও হাফশার্ট। মুখে সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের ক্লান্তি। কথা বলতে বলতে হাত মুঠো করে আর হাতের শিরাগুলো ফুলে ফুলে ওঠে।

ইউনিয়ন আপিসের জীর্ণ চালার ওপরে লালঝাণ্ডা উড়ল। মে দিবসের শপথ! এখানে দাঁড়িয়ে প্রোজেক্টের দিকে তাকালে কারিগরপাড়ার এ-টাইপ ও বি-টাইপ কোয়ার্টার ছাড়া বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। সেই তিনতলার ছাদের ওপরে চল্লিশ ফুট উঁচু এরিয়াল মাস্ট কোথায় চাপা পড়ে গেছে, কারখানা এলাকার উঁচু সার্চপোস্ট গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য, সাহেবপাড়ার চিহ্নমাত্র নেই। সেণ্ট্রাল পাওয়ার হাউসের এগারো কিলোভোল্ট হাইটেনশন তার এখান থেকে অনেক দূরে। আরেকটু পরে শুধু দেখা যাবে সবুজ পাহাড়ের ওপরে সবুজ তারার মতো একটা বাতি, আর কারিগরপাড়ার এ-টাইপ ও বি-টাইপ কোয়ার্টারের সামনে মালার মতো রাস্তার আলো। আর সন্ধ্যার প্রাক্-কালে দূরবিসর্পী রেললাইন ও অন্তরালবর্তী প্রোজেক্টের মাঝখানে লালঝাণ্ডা উড়ল সমস্ত রং ও রেখার একটা কেন্দ্রীভূত শিখার মতো। মে মাসের বুকচাপা গরমে টান হয়ে দাঁড়াল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দশজন শ্রমিক। আর গান গেয়ে উঠল: কসাইখানায় বন্দী হলেও ছাড়ব না এই লড়াই! মে-দিবসের শপথ!

একুশে আইন



দুপুরবেলা শম্পাদের বাড়িতে খাবার কথা ছিল। স্নান করে রওনা হচ্ছি হঠাৎ টেলিফোনে জরুরী তলব। এক্ষুনি অ্যাডমিনিস্‌ট্রেটিভ আপিসে গিয়ে টাউন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেরি করা চলবে না, টাউন ইঞ্জিনিয়ার নাকি লাঞ্চে না গিয়ে খাসকামরায় বসে আছেন।

সাইকেলে যেতে মিনিট দশেক সময় লাগে। সেই সময়টুকুতে আকাশপাতাল ভেবেও কোনো কূলকিনারা পেলাম না। অফিসার লাঞ্চ বন্ধ করে বসে আছেন এমন অঘটন আর কোনো দিন ঘটেছে বলে মনে পড়ল না। সূর্যের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন আছে কিন্তু অফিসারের লাঞ্চ-টাইমের এতটুকু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।

অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেটিভ আপিসের দোতলায় উঠেই মনে হল, ভয়ানক একটা কিছু কাণ্ড হয়েছে। কোনো অফিসারই লাঞ্চে যাননি নাকি? পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন সবাই। এমনিতে অফিসাররা পারতপক্ষে খাস-কামরার বাইরে পা দেন না। একই কামরায় পাশাপাশি টেবিলে কথা বলতে হলেও অনেক সময় টেলিফোনের সাহায্য নেন। আজ ভয়ানক একটা কিছু কাণ্ড ঘটেছে নিশ্চয়ই। আপিসের চাপরাশি-কেরানিরা পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

একজন ঠিকাদার এসেছিল টাউন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে। সাধারণত ঠিকাদাররা এলে অফিসাররা অন্য সমস্ত কাজ ফেলে তাদের কথা আগে শোনে।

সে-সময়ে অন্য কাউকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু আজ টাউন-ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদারকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেই খবর পাঠালেন, আজ তাঁর সময় নেই, দেখা হবে না। ঠিকাদারটি কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষকালে চাপরাশিকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, কী ব্যাপার হে ?

অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো মুখ করে চাপরাশি বললে, বোধ হয় পিসিডেন আসছেন।

ঠিকাদার হেসে উঠল : দূর !

প্রেসিডেন্ট এলে একমাস আগে থেকেই টের পাওয়া যেত। নতুন নতুন কন্ট্রাক্ট পাওয়া যেত কিছু। একবার এসেছিলেন মনে নেই ?

চাপরাশি বিরক্ত হয় : মনে আছে বলেই তো বলছি।

টাউন ইঞ্জিনিয়ারের কামরার সামনে করিডোরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ সিকিউরিটি অফিসারের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। আমাকে দেখেই সিকিউরিটি অফিসার চোখমুখ ঘোঁচ করে প্রকাণ্ড একটা হাঁচি দিলেন, মট্ করে প্যান্টের একটা বোতাম ছিঁড়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল। সিকিউরিটি অফিসার বললেন, এই যে, এই যে, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? ভেতরে আসুন।

বলে তিনি নিজেই এমন শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে বডিগার্ড পুলিসটা পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

ভেতরে গিয়ে আসল ব্যাপারটা জানা গেল। অ্যাড্ভার্স পুলিস রিপোর্ট ! চোদ্দ দিনের নোটিস দিতে পর্যন্ত সাহস হয়নি। অগ্রিম মাইনে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিদেয়। তখন দুটো বেজে গেছে, পাঁচটার মধ্যে এত বড়ো একটা সেক্শন্-এর চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে প্রোজেক্ট্ ছাড়তে হবে।

একাধিক অফিসার পরিবৃত হয়ে সই করে চিঠি নিলাম।

সিকিউরিটি অফিসার বললেন, আপনার আপিসে যাবেন তো চার্জ বুঝিয়ে দিতে ? নিচে ল্যাণ্ডরোভার তৈরি আছে।

আমি বললাম, আমার সঙ্গে সাইকেল আছে, সাইকেলেই যেতে পারব।

আঁতকে উঠে সিকিউরিটি অফিসার বললেন, না! না! আপনার সাইকেল আমি লোক দিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি। আপনি ল্যাণ্ডরোভারে যান।

নিচে নামতেই চোখে পড়ল, টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জের দরজায় রাইফেলধারী সেপাই বসেছে। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, তিন-তিনজন লোক কোনো রকম ছলছুতো না করেই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ইচ্ছে ছিল, একবার এক্‌স্‌চেঞ্জের ভেতরে ঢুকে শেষ দেখা করে আসব। মানুষগুলোর সঙ্গে তো বটেই যন্ত্রের সঙ্গেও। তিন মাস ধরে একটি একটি করে তার লাগিয়ে আমি এত বড়ো এক্‌স্‌চেঞ্জকে খাড়া করেছি। ওই ঘরের প্রত্যেকটি নাট-বলটুকে আমি চিনি, প্রত্যেকটি তারের রং আমার মুখস্থ। ব্যাটারি বসাবার সময় পজিটিভ ও নেগেটিভ প্লেট খাঁজে খাঁজে সাজাতে গিয়ে আমার দুই হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, সেই চিহ্ন এখনো মিলিয়ে যায়নি। অ্যাসিড ঢালবার সময় জামা-প্যাণ্টে অ্যাসিড পড়ে জালের মতো ঝাঁজরা হয়ে গেছে। ষোলো মাসের চাকরি-জীবনে আমার দিনের চিন্তা আর রাতের স্বপ্ন এই টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জ, আমার নিজস্ব সৃষ্টি, আমার প্রেম। আমার স্ত্রীও কোনোদিন আমাকে সবদিক দিয়ে এতটা আচ্ছন্ন করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

আজ এই এক্‌স্‌চেঞ্জের সামনে রাইফেলধারী সেপাই বসেছে!

আমাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে পেছনের লোক তিনজনের একজন বললে, আপনার ল্যাণ্ডরোভার এদিকে নয়, ওদিকে।

ঠাট্টা কিনা বুঝলাম না; টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জের সামনে তিন ফুট চওড়া ঘেরা বারান্দায় জানলা ফুঁড়ে ল্যাণ্ডরোভার এসে নামবে না সে-বুদ্ধি আমারও আছে।

আপিস যাবার পথে বড়ো রাস্তার এক জায়গা থেকে শম্পাদের বাড়ি দেখা যায়। ল্যাণ্ডরোভার চোখের পলকে সেই জায়গাটুকু পার হয়ে গেল। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই আমি দেখলাম, বারান্দায় দুটি স্থির নারী-মূর্তি। এতক্ষণে আমার মনে পড়ল, আমি এখনো অভুক্ত আর আমার জন্যে হয়তো আরো দুজন না-খেয়ে অপেক্ষা করছে।

ড্রাইভারকে বললাম, আমার নিজের একটু কাজ আছে, এগারো নম্বর রাস্তা দিয়ে ঘুরে চলুন।

সে বললে, হুকুম নেই ?

আপিসে গিয়ে চার্জ বুঝিয়ে দিতে দিতে বার দশেক টেলিফোন বাজল। প্রত্যেকবারেই এক কথা: কতদূর হয়েছে ? পাঁচটার আগে যে-করে হোক শেষ করতে হবে। দশজন খালাসী, একজন লাইনম্যান ও একজন কার্পেণ্টার বাইরে কাজ করে, পাঁচটার আগেই আপিসে যন্ত্রপাতি ফেরত দিয়ে যায়। সেদিন আর তারা ফিরল না। পরে শুনেছিলাম, সিকিউরিটি বিভাগের লোক ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে সারা প্রোজেক্ট্ ঘুরে প্রত্যেককে একজন-একজন করে খুঁজে বার করেছে এবং নির্দেশ দিয়েছে যে কেউ যেন সেদিন আপিসে না ফেরে। সোজা বাড়ি চলে যাবে। কারও সঙ্গে কারও যেন দেখা না হয়। পরদিনের কাজ ? পরদিন কোনো কাজ করতে হবে না, হাজিরা দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে সবাই। কোনো কিছুতে যেন হাত না দেয়। কোনো কিছু যদি সারাতে হয় বা কোথাও লাইন টানতে হয় তবে একজন বড়ো অফিসার এসে সামনে দাঁড়াবে, তারপর যেন তারা কাজ শুরু করে।

এক্স্চেঞ্জের একজন মহিলা অপারেটর বাথরুমে ঢুকেছেন আর বন্ধ দরজার সামনে সিকিউরিটি সেপাই অ্যাটেন্শন্ হয়ে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর প্রত্যেকের নামে নামে লম্বা চিঠি। অমুক জায়গায় যেতে পারবে না, অমুক জায়গায় বসতে পারবে না, অমুক জায়গায় দাঁড়াতে পারবে না, এক্স্চেঞ্জে যাতায়াতের জন্যে বিশেষ এক অনুমতি-পত্র। দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে এত সব আইন-কানুন-নির্দেশ-কবুলতিনামা। সাত বর্গ মাইল আয়তনে প্রতিটি রাস্তায় ঘুরে এক্স্চেঞ্জের জনদশেক অপারেটর ও একজন ফিটারকে খুঁজে বার করে কাগজপত্রে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। সিকিউরিটি বিভাগের রিজার্ভ ফৌজ সমাবেশ করে কর্ডন করা হয়েছে জায়গায় জায়গায়। সমস্ত আয়োজন দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে।

পাঁচটার সময়ে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়েছি, দেখি সেই তিনজন লোক। আগে যে লোকটি একবার কথা বলেছিল, সে-ই আবার বললে, আপনাকে এবার কোয়ার্টারে ফিরে যেতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

সে বললে, সেখানে লোকজন অপেক্ষা করছে। আপনার কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে।

আমি বললাম, আচ্ছা আপনারা যান আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সে বললে, হুকুম নেই।

ভেবেছিলাম অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে আসতে পারব। আমার জিনিসপত্র বলতে একটি বিছানা ও একটি সুটকেশ। কিন্তু পরে বুঝলাম কাজটা যতো সহজ ভেবেছিলাম তা নয়। ষোলো মাসের জীবনে কাজের জিনিস না হোক আবর্জনা জমেছে প্রচুর। ফেলতেও মায়া হয় আবার বোঝা বয়ে নিয়ে যাবারও কোনো অর্থ হয় না। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে পাওয়া একগোছা চিঠি জড়ো করা আছে তাকের ওপর। অধিকাংশ চিঠিই একবারের বেশি দু-বার পড়িনি। কিন্তু আজ হঠাৎ ইচ্ছে করছে, অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে প্রত্যেকটা চিঠি আবার পড়ি।

চিঠিগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে গত ষোলো মাসের জীবন ছবির মতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাত্র ষোলো মাস, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন জীবনের একটা বৃহৎ অধ্যায়ের পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছি। এক্সচেঞ্জে তার লাগাবার সময় নানা খুঁটিনাটি বিষয় কাগজে লিখে রাখতে হত। চিঠিপত্রের তাড়ার ভেতর থেকে সেই সব কাগজও বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ বসে উল্টেপাল্টে দেখলাম।

যে লোকটি জলের কল বন্ধ করবার জন্যে এসেছিল, সে হঠাৎ সামনে এসে মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

আমি বললাম, বলুন।

ওই কৌটোটা কি আপনি নিয়ে যাবেন? আপনার কাজে না লাগে তো আমি নিয়ে যাই।

আমি তাকিয়ে দেখলাম। বড়ো সাইজের গোল একটা টিনের কৌটো। লেবেলটা এত অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে নতুন অবস্থায় এটি কোন্ জিনিসের ঘোষণা-পত্র হয়ে কৌটোর গায়ে এঁটেছিল তা আর বোঝবার উপায় নেই। আমার মনে পড়ল, 'চেনা-জানার আসরের' দ্বিতীয় বৈঠক হয়েছিল আমার কোয়ার্টারে। সেদিন শম্পা এই কৌটোভর্তি চানাচুর এনেছিল। তারপর কৌটোটা এখানেই ফেলে গেছে।

আমি বললাম, এই বিছানা আর সুটকেশ ছাড়া আর সব জিনিসই আমি ফেলে যাচ্ছি। আপনারা যা খুশি নিয়ে যান।

লোকটি বললে, আমার শুধু এই কৌটোটাই দরকার।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি করবেন এই কৌটোটা দিয়ে?

লোকটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত করে তারপর নিচু গলায় বললে, আপনার কাছে আর লুকিয়ে কি হবে? রোজকার বরাদ্দ থেকে এক মুঠো করে রেখে কিছু চাল আমাদের জমেছে। এই কৌটোটায় ভরে সেই চাল পাঠিয়ে দেব।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় পাঠাবেন?

লোকটি এবার একটু অবাক হয়ে বললে, আপনি জানেন না? দু-নম্বর ব্যারিয়ার গেটের বাইরে একদল শ্রমিক অনশন ধর্মঘট শুরু করেছে। তাদের সাহায্যের জন্যে এখানে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। মাসের শেষ দিকে পয়সা দিয়ে সাহায্য করবার মতো অবস্থা আমার নয়, তাই কিছু চাল জমিয়েছি।

এই ঘটনা আমি জানতাম না। ভালো করে জেনে নেবারও সুযোগ হল না। ঠিক সেই সময়ে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেণ্টের একজন লোক ঘরের ফ্যান খুলবার জন্যে মই নিয়ে ঢুকতেই লোকটা দ্রুত পায়ে চলে গেল।

সুটকেশ-বিছানা নিয়ে বাইরে আসতেই দেখি, সেই ল্যাণ্ডরোভার তখনো দাঁড়িয়ে, আর সেই তিনজন লোক। সেই লোকটি এগিয়ে এসে বললে, চলুন

ল্যাণ্ডরোভার তৈরি। বলে হাঁকডাক করে বিছানা আর সুটকেশ ল্যাণ্ডরোভারে উঠিয়ে নিলে।

আমি বললাম, আচ্ছা বেশ এ-দুটো আপনারা স্টেশনে পৌঁছে দিন, আমি একটু পরে যাচ্ছি। আর ট্রেন তো সেই রাত বারোটায়।

লোকটি বললে, আপনাকে ষোলো মাইল দূরের জংশন স্টেশনে পৌঁছে দেব। সেখান থেকে ট্রেন পাবেন।

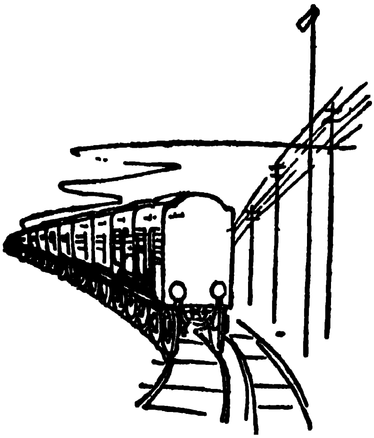
এটাও কি হুকুম নাকি?

লোকটি বললে, হ্যাঁ।

আমি আবার বললাম, এখানে কারও সঙ্গে দেখা না করতে দেবার হুকুমও আছে কি?

লোকটি বললে, হ্যাঁ, তাও আছে।

আমার হাতে একটি রেলের রসিদ দিয়ে বললে, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে আপনার সাইকেল ছাড়িয়ে নেবেন।



কিন্তু শেষ বিস্ময় তখনো আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তখন আমার মনের একটা অদ্ভুত অবস্থা। যন্ত্রণাও নয়, আনন্দও নয়। বহুদিন ভেবেছি, এই কারানগরী থেকে মুক্তি পেলে উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আরেকবার প্রাণভরে নিশ্বাস নেব। কিন্তু আজ সত্যিকারের মুক্তি পাবার পরেও বার-বার মনে হচ্ছে, এর ব্যথার দিকটাও বড়ো কম নয়। কারাগার থেকে মুক্তি পাবার সময়ে বন্দীরা কাঁদে শুনেছি। ওয়ার্ডের উঠোনে অনেক যত্নের বেলফুলের ঝাড়টির কথা মনে করে মন কেমন করে, সহবন্দীদের কথা ভেবে কারাগারের বাইরে পা দিতে ইচ্ছে করে না। আমার মনে আছে, আমার মা এক দীর্ঘ রোগভোগের সময়ে চিত্তরঞ্জন্ সেবাসদনে ছিলেন। সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পরে তিনি হাসপাতালের সেই বিশেষ বেডটিকে ভুলতে পারতেন না। আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, একবার নিয়ে যাবি হাসপাতালে? শুধু ওই বেডটা একবার দেখব। আমি বলতাম, তুমি পাগল হয়েছ মা? এখন বুঝতে পারি, এটা শুধু আমার মারই পাগলামি নয়, সব মানুষের মধ্যেই এই পাগলামি কম-বেশি আছে। আর এই পাগলামিটুকু আছে বলেই এত দুখের পৃথিবী এখনো এত সুন্দর।

স্মৃতির পর্দায় অজস্র ছবি ভিড় করে আসছে। বিশেষ করে কতকগুলো খুবই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ঘটনা কিছুতেই যেন ভুলতে পারছি না। আশ্চর্য উজ্জ্বল রঙেরেখায় প্রাণবন্ত কয়েকটি ঘটনা। এতদিন পরে মনে পড়েছে সেই রোগা মাসের

জীবনে সবটাই অন্ধকার নয়। মনের মণিকোঠায় জমা করে রাখার মতো কিছু সঞ্চয়ও আছে।

মনে পড়ছে বিরূপাক্ষকে, একত্রিশ টাকা আট আনা মাইনে পেয়েও যে সোনালী ফসলের স্বপ্ন দেখে। মনে পড়ছে, সবুজ আলোজলা একটা পাহাড় আর বেণীসংবদ্ধকুন্তলা একটি কালো মেয়ে। জনম মরণ জীবনের দুটি দ্বার! মৃত্যুও কি জীবনের দ্বার? মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে-জীবনকে পাওয়া যায় সে কোন্ ধরনের জীবন?

এই মুহূর্তে মৃত্যুর কথাই বারবার মনে আসছে। আমি জানি, এর পর হয়তো আমাকে সারা জীবনই বেকার জীবনের জ্বালা সহ্য করতে হবে। এখানে আমার নামের পাশে যে লাল কালির ছাপ পড়ল, তা এবার থেকে তাড়া করে ফিরবে আমাকে। যেখানেই যাই না কেন, কিছুতেই টিকতে দেবে না। সরকারী চাকরি থেকে যে বরখাস্ত হয় তার কপালে অন্য কোনো চাকরি জোটে না। এমন কি স্কুলের মাস্টারিও নয়। অনন্তর কথা মনে পড়ছে। ভদ্রাসন বাঁধা দিয়ে বাপ লেখাপড়া শিখিয়েছিল। ছেলে চাকরি করবে, ছেলে বাপের দুঃখ দূর করবে! গানের সুরের মতো ঘোমটা-টানা একটি মুখ অনেক কল্পনার জাল বুনেছিল চাকরিনির্ভর স্বামীর দিকে তাকিয়ে।

দাদা আপনাকে কিন্তু একবার আমাদের দেশের বাড়িতে যেতে হবে।

আমার অসুখের সময় একবার আমাকে বলেছিল অনন্ত।

কেন? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

আমাদের পুকুরের মাছ খাওয়াব আপনাকে।

কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম, পুকুরের সেই মাছ অনন্তকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে? বন্ধক-দেওয়া সম্পত্তি আর কতদিন দখলে রাখতে পারবে অনন্ত? সেই নিরাভরণ রিক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে গানের সুরের মতো ঘোমটা টানা মুখ একদিনও কি চোখের জল ফেলবে না?

তুর টাকা চাই?

কালো ঢ্যাঙা চেহারা, রেখাকুঞ্চিত মুখ আর পিট দেওয়া দড়ির মতো ফুলে ওঠা পেশী। সেই একেবারে গোড়ার দিনটি থেকে কাজ করছে এখানে। ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ছোট-বড়ো পাহাড়। বুলডোজার চালিয়ে সমান করে দেওয়া হয়েছে খানা-খন্দ আর উঁচু-নিচু। রাইফেলের গুলি শুরু করে দিয়েছে মাদলের বোল।

আর এখন আটশো পাউণ্ডের তামার তার সূর্যের আলোয় ঝকমক্ করে ওঠে। মনে হয়, এগারো কিলোভোল্টের অসহ্য চাপে তামার তার থেকে বিদ্যুতের ঝলক উঠছে।

বড়ো বড়ো সাপ আর বিছে বেরিয়ে এসেছিল মাটির ফাটল থেকে। একেকটা রাত্রি কেটেছে একেকটা দুঃস্বপ্নের মতো। চমকে চমকে উঠতে হয়েছে ঘুমের মধ্যে।

ইস্পাত আর কংক্রীটের কবিতা।

বিয়ের পর একদিন সুমিতা চ্যাটার্জি বেড়াতে এসেছিল আমার কোয়ার্টারে। হাসতে হাসতে ব লেছিলাম, আপনার বাহনটিকে সঙ্গে আনলেন না কেন?

সুমিতা চ্যাটার্জি বলেছিল, বাহনটির সঙ্গে আজ একটু রাগারাগি করেছি। কেন? প্রশ্নটা আচমকা মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

সুমিতা চ্যাটার্জি জবাব দিয়েছিল: বড়ো একঘেয়ে লাগছিল সকাল থেকে। তাই একটু রাগারাগি করে এলাম। ফিরে গিয়ে রাগ ভাঙাব। বেশ খানিকটা নতুনত্ব হবে—কি বলেন?

আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার বলেছিল, মানুষকে রাগাতে আমার খুব ভালো লাগে। তাই বলে সবাইকে নয়!

বলে হো-হো করে হেসে উঠেছিল।

সবুজ পাহাড়ে লাল সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

কিন্তু একদিনও হাসতে দেখিনি সুধন্যা গোস্বামীকে। কুয়াশাম্লান শিশির-শুভ্র হেমন্তঋতু। আপিসে মাথা নিচু করে কাজ করতে করতে হঠাৎ দু-চোখে চিন্তার

ছায়া নেমে আসে। কি যেন একটা কথা বলতে চায় কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না।

'আপনি চলে যাচ্ছেন!'

সবুজ পাহাড়ের সেই লোকটির ব্যাকুল ডাক শুনতে পাচ্ছি। ঠোঁটদুটো জ্বালা করে উঠছে।

লোকটির সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। এই মুহূর্তে মনে হতে থাকে লোকটি আমার ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। শুধু সেই সবুজ পাহাড়ের পাথরটির ওপর বসে নয়, সারা প্রোজেক্টে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন কোনো আড়াল থাকবে না তার মুখে। কুষ্ঠ-ক্ষয়িত স্বাস্থ্য ততোদিনে ফিরে পেয়েছে সে আবার। আর ইরেক্টিং শপের ফোরম্যান আমাকে বলবে, সত্যি, দেখে আসুন কারখানার ভেতরটা। আমাদের দেশের মস্ত এক গর্ব!

কারখানা যেন বিশ্বকর্মার কর্মশালা! ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রের সঙ্গে তাল রেখে আগুনের ফুলকি ছিটকে ছিটকে আসে। আগুনে তাতানো লাল লোহা উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে যায়। অক্সি-এসিটেলিনের তীব্র শিখায় অন্ধ হয়ে যায় চোখের দৃষ্টি।

জবাব চাই!

এই শেষ কথা বলে অ্যাকাউন্টস্-এর সেই কেরানি ছেলেটি কয়েদী-ভ্যানে উঠেছিল। কারামুক্তির পরে কাজে ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল তাকে।

তারপরে আবার লাইব্রেরি-সংক্রান্ত ব্যাপারে ছাঁটাই করা হয়েছে।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার কোয়ার্টারে এসে হাজির। সরাসরি বড়ো রাস্তা দিয়েই এসেছিল। গোপনীয়তার কোনো প্রয়াস তার ছিল না। আমি বলেছিলাম, আপনার সাহস তো কম নয়!

আমার কথা বুঝতে পারেনি।

কেন?

প্রোজেক্টের ভেতরে চলাফেরা করাটা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়।

একটু হেসে ও বলেছিল, যতোক্ষণ কারখানার দশজন লোকও আমার পক্ষে আছে, সিকিউরিটি অফিসারের সাধ্য নেই আমাকে গ্রেপ্তার করে।

কথাটা অন্য যে-কোনো লোকের মুখে হয়তো গোঁয়ার্তুমির মতো শোনাত। কিন্তু আশ্চর্য, ওর মুখে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল।

টেলিফোন মারফত কলকাতায় একটা জরুরী খবর পাঠাবার জন্যে সেদিন ও আমার শরণাপন্ন হয়েছিল। যাবার সময় বলে যায়, আমরা আবার ফিরে আসব।

কথাটার অর্থ সেদিন আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। কোথায় ফিরে আসবে?

আর ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে বিরূপাক্ষ। বলে, ই যায়গায় কিছু নাই! ছুটি নিতে চায় না। দিন গুণে গুণে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে কবে চলে যেতে পারবে এখান থেকে। একটি দিনের জন্যেও মন টেকে না।

আমি একদিন বলেছিলাম, বিরূপাক্ষ হাতের কাজটা ভালো করে শিখে নাও। এতবড়ো কারখানা, এতবড়ো প্রোজেক্ট, হয়তো এখানেই তোমার একটা ভালো কাজ হয়ে যেতে পারে। দেশে ফিরে গিয়ে কি করবে?

বিরূপাক্ষ ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল যে ফিরে তাকে যেতেই হবে।

অনন্ত কিন্তু এখানেই থাকতে চেয়েছিল।

আর যতো মানুষই ফিরে আসুক, যতো মানুষই চলে যাক, সেই তিনতলার ছাদের ওপরে চল্লিশ ফুট উঁচু এরিয়াল মাস্ট আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। এমন কি হতে পারে না যে হঠাৎ একদিন সারা পৃথিবীর বেতারবার্তা এখানে ধরা পড়ে যায়! প্রচণ্ড নির্ঘোষে ছড়িয়ে পড়ে সারা প্রোজেক্টে!

সারা প্রোজেক্ট থেকে এরিয়াল মাস্ট দেখা যায়, হস্‌পিটাল রোডের অশ্বত্থ গাছের চেয়ে উঁচু, অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ বিল্‌ডিং-এর পাশে ইলেক্‌ট্রিক ডিপার্টমেণ্টের সার্চ-পোস্টের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে।

আর সাইনবোর্ড ঝুলছে প্রোজেক্ট্‌ থেকে অনেক দূরে স্টেশনের পূব দিকে জীর্ণ এক বস্তি-ঘরের সামনে।

কসাইখানায় বন্দী হলেও ছাড়ব না এই লড়াই!

গান গেয়ে উঠেছিল দশজন শ্রমিক। সে দিবসের শপথ!

আপনাকে মা ডাকছেন।

কেরানিপাড়ার রাস্তায় কুণ্ঠিত পায়ে শম্পা এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। নিজে সামনে বসে আমাকে খাইয়েছিলেন শম্পার মা।

আর আজ সারাদিন রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে দুটি নারীমূর্তি।

একদিন কিন্তু দুজনেই আমাকে খেতে বলতে ইতস্তত করেছিল। বোসসাহেব হঠাৎ বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। খুব ঘটা করে বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল বোসসাহেবকে। তার পরদিন সকালে শম্পাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি, বিরাট আয়োজন করে শম্পার মা রাঁধতে বসেছেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত রান্না কিসের? শম্পা বললে, হিরণ্ময়দা আর দিদি আজ এখানে খাবেন। তারপর কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। শম্পার মারও কি যেন বলবার ইচ্ছে ছিল, তিনি একটু ইতস্তত করলেন, কিন্তু তারপরে আর কিছু বললেন না।

মনে আছে, বিশেষ জরুরী কাজে অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় আমি বোস-সাহেবের বিদায়-সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত থাকতে পারিনি। আমার অনুপস্থিতির ওপরে বিশেষ কোনো অর্থ আরোপ না হয় সেজন্যে বোস-সাহেবের যাবার আগের দিন তাঁর বাংলোতে গিয়েছিলাম দেখা করতে। গেট দিয়ে ঢুকতেই মস্ত লন আর সুন্দর কেয়ারি করা বাগান। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মুগ্ধ হতে হয়। অজস্র ফুল আর অজস্র রঙের সমারোহ। যত্ন আর পারিপাট্যের প্রতিচ্ছবি। মস্ত বড়ো বড়ো এককেটা গোলাপ আর সূর্যমুখী। এত সবুজ ঘন ঘাস আর এমন পুষ্পিত লতাকুঞ্জ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আমি ভেবেছিলাম বোসসাহেব নিশ্চয়ই বাঁধাছাদার কাজে খুব ব্যস্ত থাকবেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, তিনি জলের ঝারি হাতে নিয়ে বাগানের তদারক করে বেড়াচ্ছেন। তিনি আমাকে দেখতে পাননি কিন্তু আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। যে লোককে পরের দিন দুপুরের মধ্যে বাড়ি ও বাগানের মায়া

কাটিয়ে চলে যেতে হবে তার এই অনন্যমনা পরিচর্যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না।

আমাকে দেখেই তিনি হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করে চেয়ার-টেবিল আনালেন। সেই সবুজ লনের ওপর সবুজ রঙের চেয়ার আর টেবিল পাতা হল। দু-কাপ চা এল বাড়ির ভেতর থেকে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বোসসাহেব অন্যমনস্কভাবে বলেছিলেন, আপনারা রইলেন, আমি চললাম!

বোসসাহেবের গলার স্বর শুনে আমি দ্বিতীয়বার অবাক হয়েছিলাম। তাঁর গলায় এমন অন্তরঙ্গ সুর আমি কোনো দিন শুনিনি।

আরো কিছুক্ষণ বসে আমি উঠলাম। রাস্তার আলো জ্বলেছে, কিন্তু বাংলোর ভেতরটা তখনো অন্ধকার। সেই অন্ধকার বাংলোর দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, বাড়িতে কেউ নেই। দেখাশোনার পালা শেষ করবার জন্যে বেরিয়েছে।

কার কথা বলছেন তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও বুঝতে পেরেছিলাম। গেটের বাইরে এসে তাকিয়ে দেখেছিলাম আরেকবার। একটা ছায়া যেন চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল। মানুষ বলে চেনা যায়নি।

আর ঠিক এমনি সময়ে চোখের সামনে যাকে দেখলাম, তাকেও যেন চিনতে পারলাম না। বেণীসংবদ্ধকুন্তলা কালো মেয়েটি। আমার চোখের ভুল নয়। শম্পা।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখানে এলেন কি করে?

শম্পা হাসল। অনেক দিন পরে হাসতে দেখলাম শম্পাকে। বললে, কেন, লোকে যে-ভাবে আসে। এটা তো আর সিকিউরিটি অফিসারের এলাকা নয়। সিকিউরিটি অফিসারের সেদিনকার বহুমুখী কর্মতৎপরতার কথা শম্পার মুখেই আমি শুনেছিলাম। খবরটা শম্পা শুনেছিল বিকেলের দিকে। কাগজপত্র সই

করিয়ে নেবার জন্তে সিকিউরিটি অফিসার নিজে গিয়েছিলেন শম্পাদের বাড়িতে। সই হয়ে যাবার পরেও ওঠেননি, হাসতে হাসতে বলেছিলেন, মিস মিত্র, জলে বাস করতে হলে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না, একথাটা জানেন তো?

শম্পা কোনো কথা বলেনি, সিকিউরিটি অফিসার আবার বলেছিলেন, আগেকার যুগে ব্রাহ্মণদের ক্রোধাগ্নিতে পাপীরা ভস্ম হয়ে যেত; এযুগে আমরা হচ্ছি সেই ব্রাহ্মণদের উত্তরপুরুষ। যাকে খুশি ভস্ম করতে পারি। কথাটা আপনিও মনে রাখবেন। বলে সিকিউরিটি অফিসার হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন।

এই শেষ কথার উত্তরে শম্পা মৃদু স্বরে বলেছিল, পাষাণী অহল্যারও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জানেন তো?

এই ইঙ্গিতটুকু সিকিউরিটি অফিসার বুঝতে পারেননি। মেঝেতে পা ঠুকে বলেছিলেন, ভাবছেন এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্ত জায়গায় চাকরি যোগাড় করা যায়? তাহলে আমরা আছি কি করতে?

এই বলে নিজের অস্তিত্বের প্রবলতর জানানি দিয়ে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর শম্পা আমার আপিসে গিয়েছিল। সেখানে ওকে ঢুকতে দেয়নি। সেখান থেকে আমার কোয়ার্টারে। সেখানেও সিকিউরিটি পুলিস পথ আটকেছে। সেখান থেকে স্টেশনে। সেখানেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আমার দেখা পায়নি। আবার আমার কোয়ার্টারে। তারপর সোজা এই জংশন স্টেশনে।

জিজ্ঞেস করলাম, ফিরবেন কি করে?

তেমনি হাসতে হাসতে ও বললে, কেন, ট্রেনে? রাত দুটোর সময় একটা ট্রেন আছে না? এর মধ্যেই সব ভুলে যাচ্ছেন!

আমি চুপ করে রইলাম। যে জায়গা থেকে রাত বারোটার সময় ও কলকাতার ট্রেনে একা উঠতে পারেনি সেই জায়গাতেই রাত দুটোয় একা গিয়ে নামছে ভাবতেই আমার খারাপ লাগল। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে শম্পা বললে, কি ভাবছেন?

আমি বললাম, আপনি এই রাতে একা ফিরে যাবেন শুনে খারাপ লাগছে।

শম্পা চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ পরে বললে, আজ আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা কি জানেন? মনে হচ্ছে আমি যেন আর একা নই! আপনার খোঁজে স্টেশনে এসে দেখি, আমাদের আপিসের দশজন খালাসী আর লাইনম্যান প্ল্যাটফর্মের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে ডাকলে, দিদিমণি! আমি ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওরা কেন স্টেশনে এসেছে সেকথা না জিজ্ঞেস করেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি কেন স্টেশনে এসেছি তাও ওরা জিজ্ঞেস করেনি। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, আমরা একা নই! আর কেউ আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার মনে হল, একবার চেনা জানার আসর করতে গিয়ে সফল হইনি কিন্তু এতদিন পরে খুবই সহজভাবে যেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো চেনা ও জানা হয়ে গেল।

দুজনে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে চা খেলাম। মস্ত বড়ো জংশন স্টেশন। এত রাতেও অজস্র মানুষের ভিড়। ছুটোছুটির অন্ত নেই। কারও দিকে ফিরে তাকাবার অবসরটুকুও নেই যেন।

শম্পাকে বললাম, যদি সম্ভব হত তাহলে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতাম।

শম্পা লাফিয়ে উঠল: যাবেন? সত্যি যাবেন?

আমি বললাম, আপনি পাগল হয়েছেন?

শম্পা বললে, কেন নয়? বড়ো রাস্তা দিয়ে আমরা ঢুকব না। উল্টো দিকে নেমে লাইন ধরে চলে যাব। তারপরে মাঠ ডিঙিয়ে সোজা একেবারে আমাদের বাড়িতে। আপনি স্নান করবেন, আমি স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি করব। অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে চা খাব বসে বসে। তারপর আপনি আবার শেষ রাত্তিরের ট্রেনে চলে যাবেন।

আমি রাজী হলাম। বিছানা ও সুটকেস হাওড়ায় বুক করে দিয়ে ফিরে চললাম শম্পার সঙ্গে।

সেই ষোলো মাইল রাস্তা। মাঝে অনেকগুলো স্টেশন। কিন্তু এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের তা নজরে পড়ে না। দু-পাশে বিরলবসতি অসমতল প্রান্তর। নিষ্ফসল। বড়ো বড়ো গাছের ফাঁক দিয়ে একটা ভাঙাচোরা রাস্তা এঁকেবেঁকে কয়েকবার রেললাইন পারাপার করেছে। সিগনালের রক্তচক্ষু ছাড়া আর কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। বড়ো বড়ো গাছপালা আর আদিগন্ত মাঠ। স্টেশনগুলোর পর্যন্ত হদিশ পাওয়া যায় না। যেন এক আশ্চর্য নিশ্চুপ-নির্বাতির দেশ।

তবে হঠাৎ মাঝে মাঝে দেখা যাবে আকাশের একটা কোণে যেন আগুন ধরে গেছে। ওটা কুলটি আর বার্নপুরের ব্লাস্ট-ফারনেসের আভা। এত দূর থেকে কারখানা দেখা যায় না। কারখানা অঞ্চলের কোনো একটা বিচ্ছিন্ন বাতিও না। শুধু সেই আগুন-ধরানো আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু কল্পনা করা চলতে পারে।